দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় শিখপন্থের অবদান অবিস্মরণীয় — পৃঃ ২৪

২ নভেম্বর ২০২৫ তারার খোঁজ পেল ভারত

৭৮ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ১৭ নভেম্বর, ২০২৫।। ৩০ কার্তিক, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

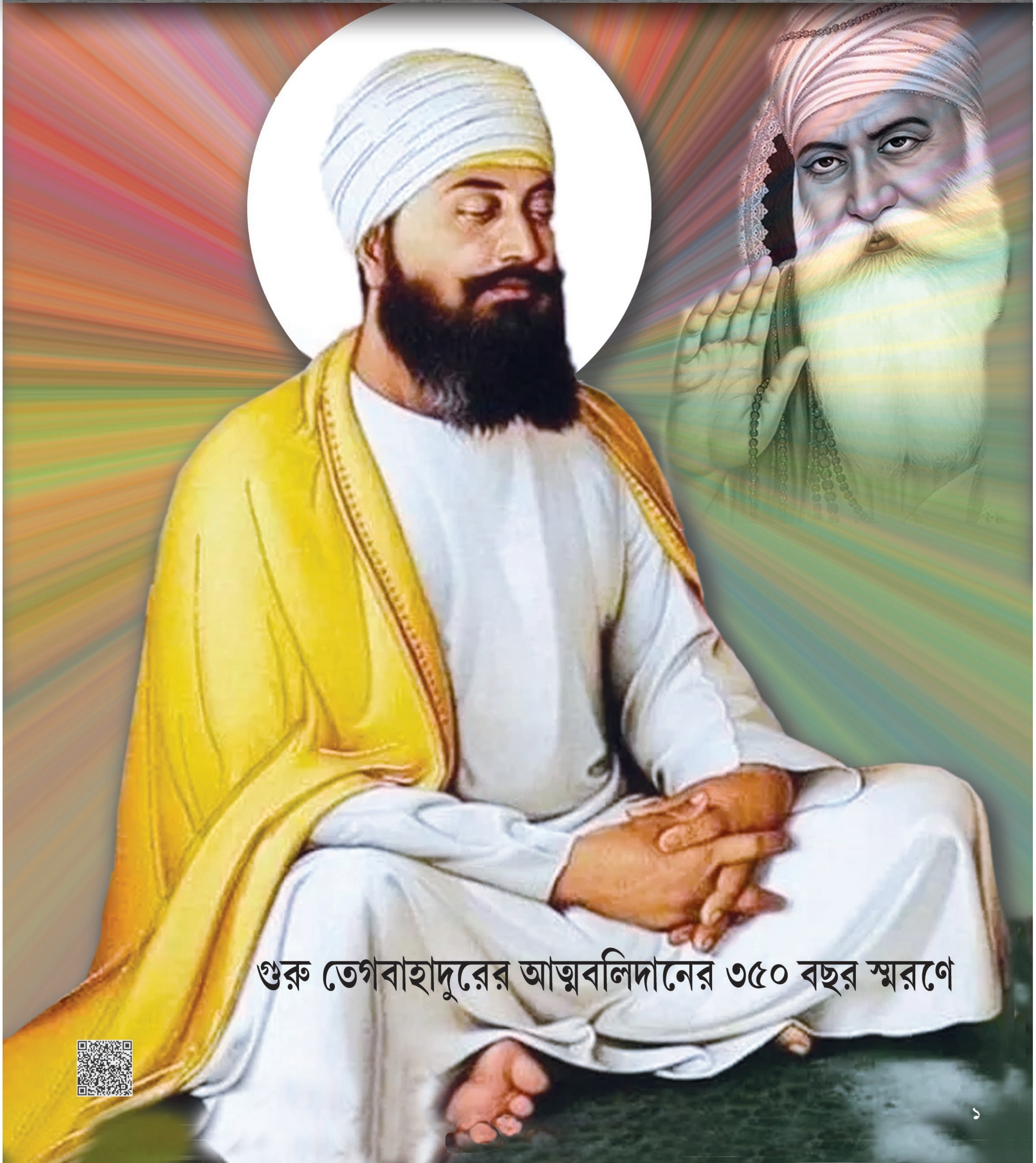

গুরু তেগবাহাদুরের আত্মবলিদানের ৩৫০ বছর স্মরণে

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ৩০ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৭ নভেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

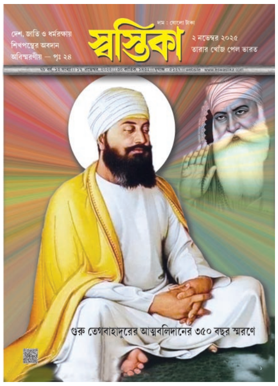

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

বিহারের ভোটের ফল প্রমাণ করবে পশ্চিমবঙ্গে 'সার' কেন প্রয়োজন ছিল : বসন্ত জাগ্রত দ্বারে ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

ভাইপো টাইপো ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে এক অসাধারণ মডেল উপস্থাপনে সফল হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ◻ ড. উদয় ভান সিংহ ◻ ৮

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ব্যর্থ 'আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা' ◻ কৌটিল্য ◻ ১০

২ নভেম্বর ২০২৫ : তারার খোঁজ পেল ভারত ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১১

আত্মবলিদান দিয়ে জাতিকে জাগিয়েছেন গুরু তেগবাহাদুর ◻ শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল ◻ ১৩

শিখ গুরু পরম্পরা এবং গুরু তেগবাহাদুর ◻ রবি রঞ্জন সেন ◻ ১৫

মানব সম্পদের মতো বিষয় উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ১৮

বাংলাদেশে ১০ কোটি মানুষ হারিয়ে গেছে ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ১৯

রাজ্যের শাসকদল এবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে হয়তো এসআইআর রোগ লেখার নির্দেশ দেবে ◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ২০

গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ◻ সৌম্য সুদর্শন ◻ ২৩

দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় শিখপন্থের অবদান অবিস্মরণীয় ◻ ড. রাকেশ দাস ◻ ২৪

ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার দৃষ্টিকোণে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু তথ্যসূত্র ◻ প্রফেসর (ড.) সোমশুভ্র গুপ্ত ◻ ৩১

বিস্মৃতির গর্ভে চলে যাওয়া এক স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিগঙ্গা বসাক ◻ সুতপা বসাক ভড় ◻ ৩৪

পিএন ঠাকুরের ছদ্মবেশে জাপানে গেলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ◻ প্রণব দত্ত মজুমদার ◻ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অন্যান্য রাজ্য থেকে ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে ◻ সোমনাথ গোস্বামী ◻ ৩৭

বিচ্ছিন্নতাবাদের এক লজ্জাজনক ইতিহাস ◻ সুজিত রায় ◻ ৪৩

দেশ ভাগ, শ্যামাপ্রসাদ ও বাস্তবতা ◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৪৭

'দিব্যজ্ঞান নয়, কাণ্ডজ্ঞান চাই' ◻ নারায়ণ শংকর দাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৭-৩০ ◻ খেলা : ৩৮ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

প্রকাশিত হবে
২৪ নভেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৪ নভেম্বর
২০২৫

ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবর্ষ

ভারতীয় জনজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভারতের জনজাতি সমাজ। নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতীয় সংস্কৃতিকে তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। ভগবান বীরসা মুণ্ডা-সহ অসংখ্য জনজাতি যোদ্ধা সমগ্র ভারতবাসীর নিকট প্রণম্য।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভগবান বীরসা মুণ্ডার ১৫০তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্য করে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক জনজাতি সমাজের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশ ও ধর্ম রক্ষায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

মহাভারত ও মনুসংহিতায় উল্লেখ রহিয়াছে 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। অর্থাৎ যিনি নিজ ধর্মকে রক্ষা করেন, ধর্মও তাঁহাকে রক্ষা করে। এই আপ্তবাক্যটি ভারতীয় জীবনদর্শনের অভিন্ন অঙ্গ। দেশ, জাতি ও ধর্মের রক্ষার নিমিত্ত জীবন বলিদানকে বীরব্রত বলা হইয়াছে। এই ভারতভূমিতে বারংবার বহিরাগত লুঠেরার দল আক্রমণ হানিয়া জাতি ও ধর্মের উপর কলঙ্ক লেপন করিয়াছে। ভারতমাতার বীর সন্তানগণ বার বার তাহা প্রতিহত করিয়াছেন। প্রয়োজনে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার অসংখ্য উদাহরণ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে উজ্জ্বলতম উদাহরণটি হইল শিখপন্থের নবম গুরু তেগবাহাদুর মহারাজের। ইসলামি শাসনকালে ক্রূর ও অত্যাচারী শাসক আওরঙ্গজেব তাহার জেহাদি প্রবণতায় ভারতভূমিকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করিবার বাসনায় এই দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীকেও ইসলামে ধর্মান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা চালাইতেছিল। তাহার প্রতিরোধকল্পে কাশ্মীরের হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিগণ গুরু তেগবাহাদুরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। গুরু তেগবাহাদুর পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজে চৈতন্য ও সংকল্পশক্তি জাগরণের জন্য আত্মবলিদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সশিষ্য দিল্লি দরবারে আগমন করেন এবং বাদশাহের ফতোয়ার প্রতিবাদ করেন। ক্রূর ও নিষ্ঠুর মুঘল সৈনিকরা তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার শিষ্য ভাই সতীদাস, ভাই মোতিদাস এবং ভাই দয়াল দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তৎপশ্চাৎ শ্রীগুরু মহারাজেরও শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁহার আত্মবলিদানে হিন্দু সমাজের চৈতন্যোদয় হয় এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে সংগঠিত হইয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে ভীষণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। গুরু তেগবাহাদুরের অসাধারণ শৌর্য ও বীরত্বের কারণে সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে 'হিন্দ্ কী চাদর' অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের ঢাল' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সেই কারণে তাঁহার পিতা অষ্টমগুরু হরগোবিন্দজী তাঁহার নাম ত্যাগমলের পরিবর্তে তেগবাহাদুর রাখেন। ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর দেশ, জাতি ও ধর্ম রক্ষায় তিনি নিজের জীবন আত্মবলিদান দিয়াছেন। দিল্লির শীশগঞ্জ গুরুদ্বারা সাহিব তাঁহার সেই আত্মবলিদানের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

ইহা খুবই লজ্জার বিষয় যে, যাঁহারা হিন্দুধর্ম রক্ষার্থে নিজ জীবন বলিদান দিয়াছেন, সেই শিখপন্থকে বৈদেশিক মতাদর্শে জারিত তথাকথিত ঐতিহাসিকরা বারংবার হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক প্রতিপন্ন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। শিখপন্থ সনাতনী পরম্পরার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা শিখ ও হিন্দুদিগকে পৃথক বলিয়া ব্যবধান নির্মাণ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁহার একাধিক গুরুবাণীতে উল্লেখ করিয়াছেন, 'শিখ ও হিন্দু অভিন্ন'। তিনি বিধর্মী অত্যাচারের প্রতিরোধকল্পে সমগ্র দেশে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, প্রতিটি পরিবার হইতে একজন পুরুষকে খালসা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার দ্বারা তিনি সমাজে এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা সম্প্রদায় নির্মাণ করিয়া দেশ হইতে বিধর্মী শাসকের উৎখাতের জন্য সার্বিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের আহ্বানের এই নিয়ম অদ্যাবধি পঞ্জাবে শিখ সমাজে চালু রহিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ গুরু গোবিন্দ সিংহকে বীর যোদ্ধা ও জাতির গৌরব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শিখপন্থের প্রবর্তক গুরু নানকদেব হইতে শুরু করিয়া দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত তাঁহাদের গুরুবাণীতে বহুবার শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীহরির নামোল্লেখ করিয়াছেন। মেকলে মানসিকতা-জাত তথাকথিত ঐতিহাসিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া সমগ্র ভারত শিখপন্থকে হিন্দু সমাজেরই অভিন্ন অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শিখ গুরু পরম্পরার প্রতি সতত শ্রদ্ধাশীল। এই বৎসর গুরু তেগবাহাদুর মহারাজের দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় আত্মবলিদানের ৩৫০ বৎসর স্মরণে বিভিন্নভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কার্যসূচি গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্ঘ-সহ সমগ্র হিন্দু সমাজ মনে করে, গুরু তেগবাহাদুর দেশ ও ধর্মরক্ষায় ভারতীয় পরম্পরার এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

সুভাষিতম্

বিরোধিনোহপি শ্রোতব্যম্ আত্মনীনতয়া মতম্।
তৎকালং ন বিরোদ্ধব্যং যথাকালং তু খণ্ডয়েৎ।।

অর্থ ঃ বিরোধীদের মতকেও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করা নয়। পরে সময় সুযোগ বুঝে খণ্ডন করতে হয়।

বিহারের ভোটের ফল প্রমাণ করবে পশ্চিমবঙ্গে ‘সার’ কেন প্রয়োজন ছিল

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

শীত পেরিয়ে বসন্ত। বসন্তের আগমনের বার্তা দেয় শীত। বিহারের ভোটে বিজেপি-জেডি(ইউ) নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট কংগ্রেস- আরজেডি-র তুলনায় খানিকটা এগিয়ে রয়েছে বলে কয়েকটি সমীক্ষার দাবি। তাতে তৃণমূলনেত্রী ও তৃণমূল দলের হৃদকম্প লাগার কথা। বিহারে এনডিএ-র জয় নিশ্চিতভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপিকে আগামী ভোটে উদ্বুদ্ধ করবে। কিছুদিন আগেই বিজেপি ওড়িশা জয় করেছে। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন বিজেপির শরণাপন্ন হয়ে পিঠ বাঁচাতে চাইছে। ১৯৯৮ সালে জন্ম হওয়ার পর বিভিন্ন নির্বাচনে তৃণমূল বহুবার হেরেছে। কিন্তু ২০১১ থেকে হারেনি। তাই তাদের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, তাদের আর কেউ হারাতে পারবে না। এমনটাই ঘটেছিল বিদেশি বামেদের ক্ষেত্রে। তবে সেটা হয়েছিল ৩৪ বছর পর। আর তৃণমূলের ক্ষেত্রে তা মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই হয়েছে।

এনডিএ জোটের নির্বাচনী সাফল্যের ঝড়ে কংগ্রেস-আরজেডি যদি উড়ে যায়, তাহলে এটা অবশ্য বলার থাকবে যে ২০২০-র ভোটের আগে বিহারে এসআইআর বা ‘সার’ না হওয়ার ফলে বিজেপি-জেডি(ইউ)-এর সঙ্গে আরজেডি-কংগ্রেসের ভোট পার্থক্যটা কেন মাত্র ০.৩ শতাংশ ছিল; আসনের নিরিখে যা ছিল— ১৪। ফল উলটো হলে প্রমাণ হবে যে, কংগ্রেসি রাজনীতির সব চাইতে দুর্বল স্থান হলো রাহুল গান্ধীর কোনো রাজনৈতিক সত্তা নেই। তৃণমূলনেত্রীর মতো প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতার ন্যূনতম পাঠ তার নেওয়া নেই, যদিও দু’জনেই একই রাজনীতির ঘরে জন্মেছেন। ‘সার’ বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের বিরুদ্ধে যত বিযোদ্গার হয়েছে, তার কতটা নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্য বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর তা বোঝা যাবে। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ‘সার’-ব্যবস্থারও পরীক্ষা বহুগুণ। এই ব্যবস্থাকেই প্রমাণ করতে হবে যে তা কোনোরকমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট নয়। ‘সার’-এর মাধ্যমে আসল ভোটারকে তালিকায় বহাল রাখা আর নকলকে বের করার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দেশের প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রেখে সসম্মানে তাঁদের ভোটার তালিকাভুক্ত করার জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের কাছেও তা পরীক্ষা, যদিও নির্বাচনী ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগ থাকার কথা নয়। তবু বিরোধী ইন্ডিজোট নানা প্রশ্ন তুলছে। নির্বাচন কমিশনার চয়নে যে কমিটি রয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই প্রধান ব্যক্তি রয়েছেন। সেক্ষেত্রে দক্ষতার চেয়ে নির্বাচন কমিশনার কেন্দ্রীয় কর্তাদের পছন্দের ব্যক্তি কিনা তা নিয়েই বিরোধীরা শোরগোল তুলছেন।

স্বাধীনতার পর থেকেই কংগ্রেসের স্বজনপোষণ ও পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতিতে অভ্যস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক মহলের একটা বড়ো অংশ সেই সমীকরণ টেনেই বিজেপি ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে বিচারের চেষ্টা করে। কংগ্রেসি রাজনীতির অনুকরণে রাজ্যে ‘সার’-এর প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার প্রধান শর্ত হিসেবে তৃণমূলনেত্রী ও তার দল হুমকির রাজনীতি করছে। ভুলভাবে একজনও ভোটারের নাম কাটা গেলে দিল্লিতে এক লক্ষ লোক নিয়ে গিয়ে নির্বাচন কমিশন অবরোধ করার হুমকি দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, ‘সার’ নিয়ে তৃণমূলের আশঙ্কা কতটা গভীর! তৃণমূলনেত্রী প্রকাশ্যে দাবি করেছেন যে, এসআইআর-এর মাধ্যমে রাজ্যে প্রায় ২ কোটি ভোটারের নাম কাটার চেষ্টা হবে। তৃণমূলনেত্রী যে নাটকের রাজনীতি করেন এটা নতুন নয়। রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ আসনে যে পরিমাণে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে তা যে সুস্থ বা স্বাভাবিক প্রবণতা নয়, তা অনায়াসে বলা চলে। ‘সার’-এর বিরোধিতা করে তৃণমূল ইতিমধ্যেই সুপ্রিম আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এটা মানতে রাজি নন যে, তার সরকারের কাজকর্ম ভিন্ন অন্য কোনো প্রশাসনিক প্রক্রিয়া রাজ্যে চলতে পারে। ‘সার’ একটি সংবিধানগ্রাহ্য প্রক্রিয়া হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যে তা চালু হতে পারে— এই বিষয়টি তার পক্ষে মেনে নেওয়া যেন বেশ কঠিন! এর আগেও কেন্দ্রীয় সরকারের বহু প্রকল্প তিনি এ রাজ্যে চালু করতে দেননি। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, রাজ্যে ‘সার’-এর ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ‘শকুন’-এর রাজনীতি করছে শাসক দল তৃণমূল।

বিহার পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে— এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে। যদিও অনেকের দাবি তা অমূলক। বিহারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারের মানসিকতার অনেকটা তফাত। হয়তো কথাটা ঠিক। মাত্র ৮ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলের থেকে বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গের ১৩৮টি বিধানসভা আসনে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল ২০২১-সালের বিধানসভা নির্বাচনে। এসআইআর প্রক্রিয়া ভারতীয় গণতন্ত্রকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করেছে। কেন্দ্রে এনডিএ জোটের শাসনকাল প্রমাণ করছে যে, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে সরকার কতটা আগ্রহী। এই মুহূর্তে দেশের ৭২ শতাংশ রাজ্যে ক্ষমতাসীন রয়েছে বিজেপি বা এনডিএ জোট চালিত সরকার। তারপরেও কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এসআইআর-এর প্রক্রিয়া কেন চালু হলো? বসন্তের আগমনে শীতের যেমন শেষ হয়। ‘সার’-এর ফলে তৃণমূলও এই রাজ্যে ফুরিয়ে যেতে পারে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ভাইপো টাইপো

পিসিমণিষু দিদি,

ছাপাছাপির ক্ষেত্রে এই 'টাইপো' কথাটা খুব ব্যবহার করা হয়। মানে অনিচ্ছাকৃত ভুল। আপনিও কি সেটাই করছেন না! দিদি, ভাইপো এমন অনেক কিছু করছে আপনার প্রশ্রয়ে যেটা ভুল। তবে অনিচ্ছাকৃত টাইপো কিনা জানি না। সেটা বলাও যায়, কারণ টাইপো হয় সাধারণত নিজের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের জন্য। আর আপনি তো ভাইপো কোনো ভুল করতেই পারে না বলে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেন।

রাগ করলেন দিদি! কিন্তু আপনার অনুগত ভাই হিসাবেই বলছি আপনিও অনেক কারচুপিতে মদত দেন, কিন্তু ভাইপো সেই কাজটাই করছেন একেবারে খোলা হাতে। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই।

এসআইআর নিয়ে যে মহা দুর্নীতির পরিকল্পনা আপনার দল তৃণমূল করেছে তাতে নাকি কলকাতার পুরপ্রধানও বিপদ আঁচ করে আপনাকে জানিয়েছেন। কিন্তু ভাইপোর ওপর অগাধ ভরসা রেখে আপনি তাতে পাত্তা দেননি। বরং, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম নেই, তাঁদের রক্ষাকবচ হলো বাবা বা মায়ের নাম ওই তালিকায় থাকা। কিন্তু সেটাও যাঁদের নেই তাঁদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নথি দেখাতে হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নানা রকমের সার্টিফিকেট আগে থেকেই দেওয়া হলেও সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেটের উপরে। এখন অভিযোগ উঠেছে, অনেক বছরের পুরনো বার্থ সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে জানিয়ে কলকাতা পুরসভায় ভুরি ভুরি আবেদন জমা পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে জন্মের নতুন শংসাপত্রের আবেদনও জমা পড়ছে। অনলাইনে এত বেশি আবেদন জমা পড়ছে যে তা সামলাতে গিয়ে এরই মধ্যে একদিন কলকাতা পুরসভার ওয়েবসাইট বসে যায়। পরে তা ঠিক করা হলেও জাল বার্থ সার্টিফিকেট তৈরির চক্রান্ত যে হচ্ছে।

পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে হাজির হচ্ছেন সদ্য চল্লিশ বা তার বেশি বয়সি সাধারণ মানুষ। কারও বাড়ি উত্তর কলকাতায়, কারও মুর্শিদাবাদে। খবরের কাগজে পড়লাম লালগোলা থেকে কলকাতায় এসেছেন এক আনিসুর রহমান। হাতে এক টুকরো কাগজ। ইডেন হাসপাতালের নাম, শিশুর নাম ও জন্ম তারিখ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু স্ট্যাম্প অস্পষ্ট। সকাল আটটা থেকে পুরভার ৬ নম্বর গেটে লাইন দিয়েছেন।

এত বাংলাদেশি ঢুকিয়ে আপনি ভোটে জিতে যাবেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কী হবে দিদি! আপনি প্লিজ ভাবুন। বরং নির্বাচন কমিশন এমন একটা কিছু করুক যাতে পশ্চিমবঙ্গে আর ভোট না করে আপনাকে চিরস্থায়ী করে দিক।

কিন্তু দিদি, হঠাৎ করে এত লাইন হলো কেন! কারা বার্থ সার্টিফিকেট তুলছেন! ওই খবরে যা লেখা হয়েছে তাতে পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে হাজির হয়েছেন সদ্য চল্লিশ বা তার বেশি বয়সি সাধারণ মানুষ। এত বেশি বয়সের মানুষের হঠাৎ বার্থ সার্টিফিকেট লাগছে কেন! আরও বড়ো প্রশ্ন মুর্শিদাবাদের বাসিন্দারা কলকাতায় কেন সার্টিফিকেট নিতে এসেছেন!! এদের ধর্ম পরিচয় কী! যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁর নাম আনিসুর রহমান। জন্মের প্রমাণপত্রের চিরকুটে হাসপাতালের স্ট্যাম্প আবছা কেন! এই সব প্রশ্ন তো উঠবেই। জানি না নির্বাচন কমিশন এদিকে নজর দেবে কিনা। কিন্তু এই ভাবে শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, দুই ২৪ পরগনার অনেকেই কলকাতা পুরসভা থেকে বার্থ সার্টিফিকেট তুলতে শুরু করেছেন। আবার নতুন বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য যে সব আবেদন তার একটা বড়ো অংশই দেখা যাচ্ছে আবেদনকারীর জন্ম ২০০৭ সালের আগে। অর্থাৎ তাঁরা ১৮ বছর পার করেছেন এবং ভোটার হতে চান। তবে তাদের এখন বার্থ রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। একথা জানাচ্ছেন পুরসভার কর্তারাই। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম বলে তাঁদের সবটাই করতে হচ্ছে।

এটা শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যের সব জেলাতেই হচ্ছে। এটা কি ঠিক দিদি আপনিই বলুন। এত বাংলাদেশি ঢুকিয়ে আপনি ভোটে জিতে যাবেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কী হবে দিদি! আপনি প্লিজ ভাবুন। বরং নির্বাচন কমিশন এমন একটা কিছু করুক যাতে পশ্চিমবঙ্গে আর ভোট না করে আপনাকে চিরস্থায়ী করে দিক। কিন্তু এই টুকু যেন হয় যে, বাকি দেশের মতো এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় শুধু ভারতীয়দেরই নাম রয়েছে।

প্লিজ দিদি, প্লিজ। □

অতিথি কলম

ড. উদয় ভান সিংহ

রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে এক অসাধারণ মডেল উপস্থাপনে সফল হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি এবং প্রবলভাবে সমাজে রাষ্ট্রীয়তার প্রচার-প্রসারের কাজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রথম থেকেই করে আসছে। আজ সঙ্ঘ কেবল ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের সামনে রাষ্ট্রীয়তা, প্রগতি ও যুগানুকূল পরিবর্তন-সহ সর্বসমাবেশক, সশক্ত, অনুকরণীয় মডেল হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯২৫ সালে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার সঙ্ঘের স্থাপনা করেন। ২০২৫-এ শতাব্দীবর্ষ উপলক্ষ্যে '১০০ বছরের সঙ্ঘযাত্রা— বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে'— এই বিষয়ে গত ২৬, ২৭, ২৮ আগস্ট বিজ্ঞান ভবন, নতুন দিল্লিতে তিন দিবসীয় ব্যাখ্যানমালা আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের কাজ, তার উপযুক্ত উপস্থাপনা, সেবা কাজ, প্রকল্প ও পঞ্চ পরিবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। সঙ্ঘের কার্যপদ্ধতি কেবল সংগঠনের সহায়ক নয়, বরং সমাজ সংগঠিত করা এবং সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নির্মাণের এক সমগ্র দৃষ্টিকোণ।

সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ : সঙ্ঘ গত ১০০ বছরে এক ক্ষুদ্র শাখা ভিত্তিক সংগঠন থেকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো স্বয়ংসেবী সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়ার দীর্ঘ যাত্রা। সঙ্ঘের মূল কাজ শাখা, যেখানে কয়েক কোটি স্বয়ংসেবক নিয়মিত মিলিত হচ্ছেন।

সঙ্ঘের বিস্তার সমাজের সর্বস্তরে : সঙ্ঘের কাজ সমস্ত সমাজকে সফলভাবে স্পর্শ করেছে। ডাঃ মোহনরাও ভাগবত ২৬ আগস্ট ২০২৫ ব্যাখ্যানমালার প্রথম অধিবেশনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, সঙ্ঘকে ধারণা বা তত্ত্বের দ্বারা না বুঝে তথ্যের উপর ভিত্তি করে বুঝতে হবে। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতির মধ্যে প্রচারক পরম্পরা আসল। এই সমস্ত প্রচারক গ্রাম থেকে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় গিয়ে সামাজিক চেতনা জাগরণের কাজ করেন। উদাহরণস্বরূপ, স্বয়ংসেবক পরিচালিত সমস্ত সংগঠনে মহিলা, ছাত্র, জনজাতি ক্ষেত্রে সকলের যোগদান হয়েছে যার দ্বারা সব প্রকারের ভেদভাব দূরীভূত হয়েছে।

ব্যবহারিক সেবা প্রকল্প : সেবাই পরম ধর্ম— এই আপ্তবাক্যকে মাথায় রেখে সমাজের আপতকালীন সেবাকাজ থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সমস্ত ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা কাজ করে চলেছেন। সেবা ভারতী ও বিদ্যাভারতীর মতো সংগঠন সঙ্ঘের ছত্রছায়ায় ও প্রেরণায় কাজ করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় স্বয়ংসেবকরা লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে খাদ্য, ঔষধ ও অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছেন। সঙ্ঘঅনুপ্রাণিত অখিল ভারতীয় শিক্ষাসংস্থা 'বিদ্যাভারতী' সারা দেশে ৫০ হাজারের বেশি বিদ্যালয় চালাচ্ছে, যেখানে কয়েক লক্ষ শিশু, ভাই-বোন শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং কয়েক হাজার গরিব শিশু নিঃশুল্ক পড়াশোনা করছে। সঙ্ঘের প্রেরণাতেই 'বন্দে মাতরম্' নাম দিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ অভিযান চালানো হচ্ছে যেখানে কয়েক লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। সরসঙ্ঘচালকজী গত ২৭ আগস্ট বলেছেন, এই সব প্রকল্প রাষ্ট্রীয় সমাজকে দৃঢ়তর করছে।

বিবিধ ক্ষেত্রে সম্পর্ক ও কার্যবিস্তার : সঙ্ঘের কাজ জনজাতি বহুল ক্ষেত্রে (ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় প্রভৃতি) যেমন শতাধিক সংগঠনের মাধ্যমে চলছে তেমনি সীমান্ত এলাকায় 'রক্ষাবন্ধনের' কার্যক্রমের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করছে। মুসলমান বহুল এলাকাতেও সঙ্ঘ কাজের বিস্তৃতি ঘটেছে, যেখানে পরস্পর বার্তালাপের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। এই কথার প্রসঙ্গে ডাঃ মোহনরাও ভাগবত স্পষ্ট ভাষায় বলেন— ইসলাম ভারতে আছে ও থাকবে। আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা সকলে এক। এর ফলে ধারণা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। সঙ্ঘ ভারতীয় সমাজে সমস্ত মত ও পথকে কেবল সম্মান করে না, সকলেই ভারতীয় সমাজের অভিন্ন অঙ্গ বলে মনে করে।

গতিবিধির মাধ্যমে কার্যবিস্তার : সঙ্ঘের কাজ স্বয়ংসেবক আধারিত,

অনুশাসন-প্রধান ও সেবামুখী। রাষ্ট্রই প্রথম, ব্যক্তি পরে— এই মতে বিশ্বাসী, যা ডাক্তারজীর সময় থেকেই প্রচলিত। সর্বাঙ্গীণ হওয়ার কারণে আলোচনার বিকেন্দ্রীকরণ, সিদ্ধান্ত স্থানীয় স্তরে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিকোণ। প্রকৃতপক্ষে এইরকম ব্যবস্থাই প্রয়োজন।

সঙ্ঘের কার্যবিস্তারের বৈশিষ্ট্য : স্বয়ংসেবক নির্ভর হলেও এখানে কোনো সদস্যতা বা পদের লোভ নেই। এই পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ যুবকের মধ্যে রাষ্ট্রভক্তির দীক্ষাদান হয়, পরবর্তী পর্যায়ে যা সামাজিক কাজে পরিণত হয়।

শিক্ষা ও চরিত্র নির্মাণ : সঙ্ঘের শিক্ষা বর্গে স্বয়ংসেবকদের নেতৃত্ব দেওয়ার কৌশল শেখানো হয়। এর ফলে স্বয়ংসেবক যেখানেই যাবে সেখানেই সাফল্যলাভ করে থাকে। তাঁরা সরকারি পদে বা ব্যক্তিগত ব্যবসায় সফল হয়। সঙ্ঘ রাজনৈতিক সংগঠন নয়, সাংস্কৃতিক সংগঠন। হিন্দু রাষ্ট্রের অর্থ কাউকে বের করে দেওয়া নয়, সবাইকে সম্মিলিত করা। এটাই হলো বিবিধতার মধ্যে একতার নিদর্শন। গত ১০০ বছরে সঙ্ঘ সমাজের বিপদে-আপদে, বন্যায় পীড়িত মানুষের সেবায় লক্ষ লক্ষ লোককে সাহায্য করেছে। বর্তমানে সঙ্ঘ প্রায় ৮০টি সামাজিক সংগঠনের (বিধিধ ক্ষেত্র) মাধ্যমে সকলকে রাষ্ট্র নির্মাণে সম্মিলিত করছে। গত ২৭ আগস্ট সরসঙ্ঘচালকজী জোর দিয়ে বলেন, সঙ্ঘের একটি 'নতুন দিগন্ত' খোলা হয়েছে যার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ, সামাজিক ন্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চ পরিবর্তন অভিযান : এই অভিযান বর্তমানে সমাজের মুখ্য বিষয়কে স্পর্শ করেছে, যার ঘোষণা ২০২৪ বিজয়া দশমীতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ২০২৫-এ তা গতি পেয়েছে। মোহনজী গত ২৮ আগস্ট তাঁর বক্তব্যে এই বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন— এর দ্বারা সমাজের দিশা ও দশা (অর্থাৎ সমাজের চলার পথ ও সামাজিক পরিস্থিতি) নির্ধারিত হচ্ছে। এই অভিযান পঞ্চপরিবর্তন আধারিত এবং এর দ্বারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব।

পঞ্চ পরিবর্তন :

(১) স্বদেশি জীবনশৈলী : আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করা, বিদেশি দ্রব্য নির্ভরতা কম করা, স্ব-এর বোধ থেকে রাষ্ট্র শক্তিশালী করা। ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ পরিবারে প্লাস্টিক ব্যবহার কমেছে এবং স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার বেড়েছে।

(২) নাগরিক কর্তব্য : তিনি সমস্ত নাগরিককে ভোট দিতে বলেছেন, স্বেচ্ছায় কর দিতে বলেছেন, নিয়ম মেনে চলতে বলেছেন। এই অভিযানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা বাড়ি বাড়ি সম্পর্ক স্থাপন করছে, তাতে যুবকদের মধ্যে নাগরিক কর্তব্যবোধ বাড়ছে। ফলস্বরূপ, ২০২৪-এর নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদীদের পক্ষে ভোটের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) পরিবেশ সংরক্ষণ : জল সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে 'মা-এর নামে বৃক্ষ রোপণ'— এই নামে অভিযান হয়েছে। মোহনজী বলেন— পরিবেশ সংরক্ষিত না হলে কেউ বাঁচবে না। এর ফলে ২০২৫ পর্যন্ত কয়েক কোটি গাছ লাগানো হয়েছে এবং অনেক নদী সংস্কার করা হয়েছে।

(৪) সমাজের সমরসতা : জাতি-ভাষা, প্রান্ত, মত, পথ ইত্যাদি ভেদভাব মুক্ত করে সমরস সমাজ নির্মাণ করতে হবে। উদাহরণ, গ্রামেগঞ্জে পিছিয়েপড়া শ্রেণী ও জনজাতির ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ছে, হিংসা কমছে।

(৫) পরিবার প্রবোধন : পরিবারের কল্যাণের জন্য তিন সন্তান গ্রহণ করা উচিত। মোহনজীর ভাষায় পরিবার হলো রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম একক। এই অভিযানের অংশ হিসেবে কোথাও পরিবার পরামর্শ শিবির করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সঙ্ঘের ব্যবস্থায় কিছু ক্ষেত্রে কর্মশালা করা হয়েছে। সদর্থক পরিণাম হলো দেশের অনেক অংশে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কমেছে এবং পারিবারিক মূল্যবোধ বেড়েছে। এই ব্যবস্থা নিরন্তর চালিয়ে রাখতে হবে। আনন্দের কথা যে, আজ এই অভিযানের কথা প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে গেছে এবং বিভিন্ন সভাতেও আলোচনা হচ্ছে। আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ পরিবার প্রভাবিত হয়েছে— এটাই সামাজিক পরিবর্তন।

শোকসংবাদ

কোচবিহার জেলার আবুয়ার পাথার শাখার স্বয়ংসেবক তথা পূর্ব প্রচারক কৃষ্ণচন্দ্র দেবনাথ গত ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ৮ বছর মালদা জেলায় প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাড়ি ফিরে এসে সারদা শিশুতীর্থে আচার্য হিসেবে যোগ দেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম কোচবিহার জেলার সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।

* * *

হুগলী জেলার চুঁচুড়া নগরের কাপাসডাঙ্গা শাখার প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা প্রাপ্ত স্বয়ংসেবক সুমন বিশ্বাস গত ২৪ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা-সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ব্যর্থ 'আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা'

কাশ্মীরে যখন সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের ওপর হামলা হয়, তখন আমাদের দেশের বামপন্থী মিডিয়া, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপক এবং সংস্কৃতিজগতের একাংশ সেটাকে 'স্বাধীনতার আন্দোলন' বলে চালানোর চেষ্টা করে। ভারতের মতো ইসলামি সন্ত্রাসবাদের শিকার ইজরায়েলও। প্যালেস্তাইনের সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামাসের মূল লক্ষ্য হলো ইহুদিদের সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়া। 'হামাস' শব্দের অর্থ— 'ইসলামিক যুদ্ধ'। কিন্তু সেটাকেও প্যালেস্তাইনের স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে চালায় আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলা, গাড়িবোমা বিস্ফোরণ কীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ? কার স্বাধীনতা? কার বা কাদের বিরুদ্ধে এই স্বাধীনতার লড়াই? লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরক বোঝাই একটি 'আই-টোয়েন্টি' গাড়ি বিস্ফোরণে প্রাণ হারান ১৩ জন সাধারণ মানুষ। আহতের সংখ্যা ৩০ জনেরও বেশি। বিস্ফোরণের আগে গাড়িটির চালকের আসনে বসেছিল— উমর নবি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই হামলার কয়েক ঘণ্টা আগেই ফরিদাবাদ থেকে প্রায় ৩০০০ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক এবং অ্যাসল্ট রাইফেল-সহ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়। এই হামলায় এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে মুজাম্মিল আহমেদ, আদিল মজিদ, আমির রশিদ মির, শাহিন সইদ-সহ মোট ৮ জন। এরা কিন্তু কেউ পাকিস্তানি নয়। এরা সবাই ভারতের নাগরিক। এদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেশে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছে। তারা হয়তো ওবিসি কোটা ব্যবহার করে আসন জোগাড় করেছে এবং ডাক্তারিতে ভর্তি হয়েছে। স্বাধীন ভারতে এদের তাহলে কীসের সমস্যা? সামাজিক ন্যায়বিচার থেকেও এরা বঞ্চিত নয়। সরকারি অর্থে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে এরা। পেয়েছে সামাজিক সম্মান। এদের তাহলে কীসের অভাব? জইশ-ই-মহম্মদ, আনসার গাজওয়াতুল হিন্দের মতো জঙ্গি সংগঠনের সদস্য এরা হলো কীভাবে ও কেন?

এখানেই সবাইকে আরও একবার ভাবতে হবে আমাদের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে। ভারতের মতো ১৪০ কোটি জনসংখ্যা-সম্পন্ন একটি বিশাল দেশে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু মাত্র পুলিশ, আধা-সামরিক বাহিনী বা গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই লড়াই সংস্কৃতির। এই লড়াই উপাসনা পদ্ধতিজাত বিশ্বাসের। এখানে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সাম্য বা বৈষম্য কোনো সমস্যা নয়। ভারতের পলিসি-মেকার বা নীতিনির্ধারকরা ভাবেন যে, কেউ যদি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, তবে সে মজহবি গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে সমাজের মূলস্রোতে মিশতে সক্ষম হবে। তাঁরা ভুলে যান যে, ওসামা বিন লাদেন বা বাগদাদি উচ্চশিক্ষিত হয়েও মজহবের স্বার্থে যত রকম পাপ ও অপরাধ সম্ভব— সব করে গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষা বা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা কিন্তু নরসংহার বা নারী সম্ভ্রমহানির মতো বীভৎস কাজ থেকে তাদের বিরত করতে পারেনি। কমিউনিস্ট নেতা স্তালিন, মাও, চেসেস্কু কি অশিক্ষিত ছিলেন? তাদের প্রতি তাদেরই দেশের নাগরিকদের আনুগত্যের বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই, সেই নিরীহ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি এই স্বৈরাচারী শাসকরা। গত শতকে এরকম হত্যার সংখ্যা দশ কোটির বেশি। ভারতের মতো দেশে আধুনিক যুগে কোনো দিন জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি বা কোনো বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়নি। সেই দেশের বরেণ্য ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে কিছু বামপন্থী ডাক্তারই। অথচ আমাদের পলিসি-মেকাররা বিশ্বাস করে এসেছেন যে, সনাতনী দর্শনহীন শিক্ষা মানুষের মনকে অন্ধবিশ্বাস মুক্ত করার পক্ষে সহায়ক। এহেন শিক্ষাব্যবস্থা নাকি দেশবাসীকে আলোর সন্ধান দিতে পারে। মজহবি অন্ধকারে ডুবে থাকা লোকজনকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার জন্য ওবিসি সংরক্ষণ দিয়ে তাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস ইত্যাদি বানাতে দ্বিধা করেনি ভারতীয় প্রশাসন। কিন্তু তাতে কি কোনো লাভ হয়েছে? মাদ্রাসায় বা তথাকথিত সংখ্যালঘুদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোরান শিক্ষা বা মজহবি প্রশিক্ষণ চলতে পারে। কিন্তু দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু দর্শন অথবা ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরাগত শিক্ষা আইনসম্মত নয়। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা ডাক্তারের যদি ছোটোবেলাতেই মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এই পার্থিব জগতে তার কিছু পাওয়ার নেই এবং যা প্রাপ্য সব মৃত্যুর পরে, তবে সেই ব্যক্তিকে শিক্ষা, মান, অর্থ, যশ— যাই দেওয়া হোক, সে থাকবে তার নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল। শৈশবে যদি তাদের মস্তিষ্ক প্রক্ষালন করে বলা হয় যে, জেহাদের মাধ্যমে কাফেরমুক্ত পৃথিবী গড়তে পারলে মৃত্যুর পর জন্নত হাসিল হবে, বা আরবীয় সাম্রাজ্যবাদী তত্ত্ব না মেনে চলা ব্যক্তিকে হত্যা বা মহিলাদের নির্যাতন করলে মৃত্যুর পর সে অনন্তকাল চরম সুখ ভোগ করবে, তবে কেন তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বানিয়ে সুখশান্তি কেনার চেষ্টা করছে গোটা দেশ?

ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের এবার একটু অন্যভাবে ভাবার সময় এসেছে। ডোল রাজনীতি বা সংরক্ষণের রাজনীতির মাধ্যমে আমরা আমাদের শত্রুদের দুধ-কলা দিয়ে পুষছি না তো? বিভিন্ন ব্যবসায় একাধিপত্য কায়েম করতে সরকারি ব্যবস্থার সমান্তরাল হালাল সার্টিফিকেট ব্যবস্থা, মাদ্রাসার মাধ্যমে সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা স্বাধীন দেশে কীভাবে চলতে পারে? আজও বহু রাজনৈতিক দল ভোটের আগে ভূমি সংস্কারের ললিপপ দেখিয়ে নির্লজ্জভাবে এই তথাকথিত সংখ্যালঘুদের তোষণ করে চলেছে এবং হিন্দুদের ধনেপ্রাণে মারার ব্যবস্থা জারি রাখছে। কেন এখনই সংবিধান সংশোধন করে হালাল সার্টিফিকেশন, কওমি মাদ্রাসা, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হবে না? কেন বন্ধ হবে না ভূমি সংস্কারের নামে হিন্দুকে শেষ করার রাজনৈতিক খেলা? আর কত রক্ত দেবে ভারত জননীর সন্তানেরা? জেহাদিদের হানায় আর কত প্রাণের বলিদান হবে এই দেশে? হিন্দুদের সঙ্গে থাকা যায় না বলে যারা দেশের মাটিকে তিন ভাগে ভাগ করল, কোন যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে তারা ৯৯ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ ভোগ করে? কোথায় যাবে হিন্দুরা? কোন দেশে যাবে? তাঁদের তো একটাই দেশ।

২ নভেম্বর ২০২৫
তারার খোঁজ পেল ভারত

গত ২ নভেম্বর মহিলা ক্রিকেট টিম এবং ইসরো মিলে যেন তারার দেশের সন্ধান দিল। সব সন্দেহ দূর করার তারিখ হয়ে রইল এই দিনটি। উড়তে যে ডানার জোর লাগে, দুই ক্ষেত্রেই সেই জোরের প্রমাণ দিল নতুন ভারত।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

নিজের শ্রেষ্ঠত্বতেই আমরা অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব জাগাতে পারি। তারই নাম আত্মনির্ভরতা। সেই আত্মনির্ভর ভারতের আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন আজ যেন রামধনু দেখছে। কত খেলা, কত রং, আর কত সৌন্দর্য। সে কোনো কুণ্ঠাগ্রস্ত দানে আর ফিরে তাকাবে না। সে শক্তি বৃদ্ধির নতুন ইতিহাস নির্মাণ করল। সে দুর্বলতার অজুহাতের আক্ষেপের সব দুর্লক্ষণ ফেলে আজ তারার খোঁজ পেল। তারার খোঁজ মিলল ঐতিহাসিক ২ নভেম্বর। সব তারারা বলে উঠল :

‘হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
...
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।’

গত ২ নভেম্বর, মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতল ভারত; তারা আকাশ ছুঁলো। ২২ গজে গজগমন নয়। গোলা-বারুদ, ক্ষিপ্রতার তিরশরীরে তারা পুঞ্জীভূত নারী তাচ্ছিল্য, মেয়েরা ঠিক কতটা পারে-র উত্তর দিল, প্রমাণ দিল। ছক্কা হেঁকে উড়িয়ে দিল সব অবমাননা, দ্বিধা, লিঙ্গ বৈষম্য। কাজে-পেশায়-দক্ষতায় লিঙ্গবৈষম্য আসলে জীবন বিজ্ঞান নয়, ওটা মনোবিজ্ঞান, তা আবারও প্রমাণিত। আরও অনেকবার হয়তো প্রমাণ করার পর তবেই বহুশতাব্দীর লিঙ্গবৈষম্যের দুর্গভিত্তি ভাঙবে। আর, ২ নভেম্বর, বহু প্রতীক্ষার আর এক অবসান। ফের ইতিহাস গড়ল ভারত। ISRO (ইসরো)-র অসামান্য সাফল্য, LVM3-এর C25 ইঞ্জিন দ্বিতীয়বার জ্বলে উঠল। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে তৈরি হলো নতুন ইতিহাস। এলভিএম-৩ রকেটের মাধ্যমে উপগ্রহ উৎক্ষেপণে এ এক বিরাট সাফল্য। গভীর মহাকাশে তৈরি হলো ভারতের পদাঙ্ক। এই রকেটের হাত ধরেই একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ তার কক্ষপথ পাবে। ১৯৭৯ সালে ইসরোর SLV3 মিশনটি ব্যর্থ হয়। SLV3 এবং কৃত্রিম উপগ্রহ প্রযুক্তির জন্য যা প্রযোজ্য ছিল তাই-ই প্রযোজ্য ছিল ভারতের মহিলা ক্রিকেট টিমের জন্য। সব আছে, কিন্তু সাফল্যের ইতিহাস যেন সোনার কাঠির ছোঁয়ায় অপেক্ষাতেই থাকে। ২ নভেম্বর ইসরো ও মহিলা ক্রিকেট টিম দুই-ই পেল সেই সোনার কাঠির পরশ। LVM3 রকেট আর ভারতের ক্রিকেট টিম কাউকেই আর পিছনে ফিরে তাকাতে হলো না। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দুয়েরই সফল হলো। আত্মবিশ্বাসী ভারত, আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় মনস্তাত্ত্বিক গঠন দুই-ই নতুন পর্ব শুরু করল ওই দিনে। SLV3 রকেট ১৯৮৩-র ১৭ এপ্রিল রোহিণী স্যাটেলাইটটিকে প্রথমবার মহাকাশে স্থাপন করে। ঠিক সেই বছরই কপিল দেবের ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপ আনল ঘরে। একই ভাবে ২০২৫ মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ আনল হরমনপ্রীত কৌরেরা। একই দিনে স্যাটেলাইট বাহুবলী সফল হলো। ঠিক যেমন ভাবে সেদিন সবাইকে চমকে বিদ্যুতের মতো ক্যাচ লুফেছিলেন কপিল দেব, যেন একই ভাবে আজ দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ক্যাচ লুফে নিল আমানজৌত কৌর, হরমনপ্রীত, জেমাইমা রডরিগেজ।

২ নভেম্বর, LVM3 রকেট যে অতিভারী CMS-03 বা GSAT-7R কৃত্রিম উপগ্রহটিকে লঞ্চ করল তা কৃত্রিম উপগ্রহের ইতিহাসে নতুন দৃষ্টান্ত। সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তির এই রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ যার ঘরোয়া নাম—‘বাহুবলী’, তা সত্যিই বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করল মহাকাশক্ষেত্রে ভারতীয় স্বনির্ভরতা। নবি মুম্বই স্টেডিয়ামে যখন ‘উড়ে এসে জুড়ে বসা’ প্লেয়ার শেফালী বর্মা তার পেশীর প্যাঁচে ব্যাট উড়িয়ে মাঠকে, পিচকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনল। দেখল সারা বিশ্ব, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও ভারতের নারীশক্তির দুরন্ত দক্ষতা। যে খেলার সঙ্গে কখনো তুলনা আসছে মহিন্দর সিংহ অমরনাথের। এই বাহুবলী স্যাটেলাইট মিশনের উড়ানটাও এসেছে একই ভাবে অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে। সবাই মনে রেখেছে ১৯৬৩-র সেই ছবি, রকেটের ‘নোজ-কোন’ সাইকেলে বহন করছেন এক বিজ্ঞানী। সেখান থেকে চন্দ্রযান, সেখান থেকে বাহুবলী। যাত্রাপথটা মিতালী রাজ, ঝুলন গোস্বামী, ছায়ার মতো পাশে থাকা মন্দিরা বেদী এবং সেখান থেকে আজকের স্মৃতি মান্ধানা, রিচা ঘোষ, রেণুকা ঠাকুর, ক্রান্তি গৌর, দীপ্তি শর্মা, উমা ছেত্রী, অরুন্ধতী রেড্ডি, রাধা যাদব, হরলীন দেওয়ল, স্নেহা রানা, প্রতীকা রাওয়াল, শ্রীচরণী এবং অতি অবশ্যই সবার গুরু, সবার ‘ক্ষীতদা’ কোচ অমল মজুমদার। যেন ইসরোর টিম ওয়ার্কের কার্বনকপি। যতক্ষণ না রকেট যথাযথ ভাবে উৎক্ষেপণ হয়, যতক্ষণ না লক্ষ্যে কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপন হয়, কক্ষে বিরাজ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধ চলে। টিক-টিক- টিক কাউন্টডাউন... মাঠেও তাই। ইসরো আর টিম

ফঃ ২

ইন্ডিয়ার একই দিনে সাফল্য যেন এক সফল তৃপ্তি মুহূর্তের সমাপতন।

আরও এক কাকতালীয়। ২০২৩-এ চন্দ্রযান ৩ যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফ্ট ল্যান্ডিং করল, তার ঠিক পরেই এক অনুষ্ঠানে হরমনপ্রীত অবিশ্বাস্য আত্মবিশ্বাসে বলেছিলেন,— একটাই লক্ষ্য, বিশ্বকাপ জয়। আকাশ ছোঁয়ার গল্পে ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান আর ওই আকাশ মুঠোয় করা খেলোয়াড় প্রাণচঞ্চল মেয়েদের মধ্যে এক অদ্ভুত, অদৃশ্য সামঞ্জস্য। সত্যিইতো Sky is not the limit — তাই-ই তো মহাকাশ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্প, আবার সেই একই ভাববোধে দীপ্ত আজ এই নবীনা ক্রীড়াবিদদের দল বিশ্বকাপ আনল। এটাতো স্বীকার করতেই হবে আমাদের দেশে মাতৃপূজার পরেও কিন্তু শেফালী বর্মার মতো কাউকে ছেলেদের মতো চুল কুচিয়ে, ছেলে সেজে ছেলেদের সঙ্গে খেলা শুরু করতে হয়েছিল। সেই শেফালীদের যখন বস্তুত লিঙ্গবৈষম্যহীন অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে লড়তে হয় তখন তা অনেক বড়ো স্নায়ুর লড়াই। কারণ হেরে গেলে সেই হারকে 'খেলোয়াড়িতে দৃষ্টিভঙ্গি'তে অনেকেই বিবেচনা করবে না। যাদের জন্য ছেলে সাজতে হয় তারা, সেই মানসিকতার লক্ষ লক্ষ মানুষরা তখন শেফালীদের খেলাধুলা, তাঁদের ক্রিকেটপ্রেমকে টাকা নষ্ট, সময় নষ্ট বলেই দাগিয়ে দেবে। একটা সফল রকেট যেমন মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধাচার করে।

মফস্‌সল থেকে উঠে আসা এই মেয়েগুলো, যাদের বাড়িতে আগে কোনো মেয়ে ট্র্যাকস্যুট পরেনি, বাড়ির ছেলেরাই ব্যাট প্যাড নেয়নি— তারাও সবাই 'মেয়ে' এই শব্দ বোধ-সংকীর্ণতার মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধাচার করেছে। মেয়ে, তাই এই কাজ ঠিক নয়, ওই কাজ বারণ। এই কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধাচার করেছে বলেই ওরা রকেটের মতো ছুটেছে। পৃথিবীর কক্ষপথে ঘুরছে বাহুবলী। আজ এই টিম ইন্ডিয়াও কক্ষরেখা তৈরি করল। নতুন অরবিটের সন্ধান দিল। একটা সময়, এইতো ক' বছর আগেও মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলেই স্বাভাবিক শব্দ প্রতিবর্ত চয়নে বলা হতো 'ভারতও পারে'। যেমন বলা হতো 'মেয়েরাও পারে'।— এই শব্দবন্ধে আঘাত হেনেছে ভারত ও ভারতীয় মেয়েরা। '-রাও পারে'র মধ্যে যেন দৈববলে সঞ্চারিত হলো 'পেরে গেল' বোধ। পারছিল না, যোগ্য নয়, হঠাৎ পারল, যা একেবারেই নেতিবাচক ব্যঞ্জনা। বলা উচিত— পারে, পারি। আত্মনির্ভর ভারতের এটাইতো মূল কথা— পারি, পারছি, আরও পারব। আত্মবিশ্বাসী ভারত কোনো বাইচান্সের জোরে টিকে থাকার স্বপ্ন দেখে না। পারার জন্য যা যা অনুশীলন, তপস্যা, সাধনা করতে হয়, সবার সঙ্গে তার অবিরাম আপোশহীন সংগ্রাম। গত ২ নভেম্বর স্থাপিত দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ ইসরো, টিম ইন্ডিয়ার মধ্যে সেই অবিচলভাবে লড়াই করে রেকর্ড গড়ার অহংকারটাই অলংকার হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

'বিকশিত ভারত' কোনো বিজ্ঞাপন নয়। এ এক রোডম্যাপ। ২০৪৭-এর মধ্যে বিকশিত ভারত নির্মাণের অংশ হলো এই মহাকাশ মিশন। বাহুবলীর সাফল্যের পর ভারতের ভাগ্যাকাশে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অনেক রুপোলি রেখা। জানা গিয়েছে যে, ২০২৮-এর মধ্যেই ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন তার যাত্রা শুরু করবে। আশা করা যায় তা ২০৩৫ সালে নিষ্পন্ন হবে। চন্দ্রযান ৪, নিশ্চিতভাবে আশার আলো দেখছে। 'ভেনাস অরবিট মিশন, ২০২৮'-এর জন্য পৃথিবী অপেক্ষারত। বাহুবলীর জন্যই আরেকটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরি হলো। সেটি হলো 'কস্ট এফেকটিভ' নেক্সট জেনারেশন লঞ্চ ভেহিকল, যার কাজ ২০৩২-এর মধ্যেই সম্পূর্ণ করবে ভারত। ২০৪০ সালে ভারতের লক্ষ্য— চাঁদে মানুষের অবস্থান। সাধারণ মানুষের জন্য মহাকাশ যাত্রা আর স্বপ্ন নয়, বরং তা 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর ক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা। প্রমাণ করাটা এক বিরাট দায়িত্ব। বাহুবলী যখন কক্ষপথে স্থাপিত হলো, তখন ইসরো বলে উঠেছিল— the orbit is stable! এটাই যে আত্মনির্ভর ভারতের আসল কথা। যে ক্ষেত্রই হোক তাতে যেন চলার পথ শক্তপোক্ত হয়। এই 'বাহুবলী' ভারতের নৌ-প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটে থেকে 'বাহুবলী' ভারতের নিরাপত্তা বলয়ে মাছিও গলতে দেবে না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করার ক্ষেত্রে এই মাইলফলক LVM3-MS রকেটবাহী CMS-03 মাল্টি ব্যান্ড উপগ্রহটি আগামী ১৫ বছর ভারতের ভূখণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত সমুদ্র অঞ্চলে শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। সাবমেরিন যোগাযোগের প্রভূত উন্নতি ঘটবে।

এই মিশনে মহাকাশ প্রযুক্তির সঙ্গে নৌ-প্রতিরক্ষার মেলবন্ধন হলো। অনেক প্রশ্ন ছিল বিজ্ঞানীদের— এ প্রকল্প শেষ পর্যন্ত রূপায়িত হবে কী হবে না। হলেও কতটা সফল হবে। ভারত-কন্যাদের বিশ্বকাপ জয়টা মাঠের জয়, মনেরও জয়। মনস্তাত্ত্বিক জড়তার বিরুদ্ধে জয়। ব্যতিক্রমী কাজ মানেই তা যেন পুরুষের জন্য বাঁধা। সেই বাঁধাধরা চিন্তার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিল ভারতীয় মেয়েরা। তাই এ এক অনেক বড়ো মিশন জয়। ইসরো ভাবছিল আবহাওয়া অনুকূল নয়। সাফল্য কি পাওয়া যাবে? ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও কিন্তু হাওয়া তৈরি হলো সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মতো জাঁদরেল টিমকে ভারত হারানোর পর। আমাদের হারানো মনোবল তারপর ফিরল। আবহাওয়ারও তারপর যেন কিছুটা পরিবর্তন হলো। ইসরো ফেল করলে তার খোঁজ যেমন কেউ নেয় না। এই মেয়েগুলো সেমিফাইনাল না টপকাতে পারলে সত্যিই কিন্তু ১০-এর খেলার পাতার ছোটো টুকরো খবরেই থেকে যেত। টুকরো খবর থেকে বিশ্বব্যাপী শিরোনাম হতে বাহুবলীর মতোই স্রোতের প্রতিকূলে থেকে নানা চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। বাহুবলী ও ইন্ডিয়া টিম নিজের জোরে সৃষ্টি করে শুভলগ্ন। ক্রিকেট হোক বা মহাকাশ গবেষণা, ভারতের উন্নতির সীমা যে আজ কোথায় তা দেখাল ভারতীয় মেয়েদের ক্রিকেট টিম ও বাহুবলী। একটি মহাকাশযান তারার দেশে ছুটছে আর টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যেক চ্যাম্পিয়ন হলো এক একটা তারা। বাহুবলী প্রমাণ করল আর কোনো বিদেশের ধার করা স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকলে বা মহাকাশযানে কৃত্রিম উপগ্রহ লঞ্চ করতে হবে না। উপগ্রহ উৎক্ষেপণে আজ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর ভারত। মহিলা ক্রিকেটারদের মতো ইসরোও উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করল বা বল ছুঁড়ল। ব্যাটের আঘাতে যা সত্যিই আকাশ স্পর্শ করল। গত ২ নভেম্বর মহিলা ক্রিকেট টিম এবং ইসরো মিলে যেন তারার দেশের সন্ধান দিল। সব সন্দেহ দূর করার তারিখ হয়ে রইল এই দিনটি। উড়তে যে ডানার জোর লাগে, দুই ক্ষেত্রেই সেই জোরের প্রমাণ দিল নতুন ভারত। দেশীয় সক্ষমতার দৃষ্টান্ত হয়ে রইল ২ নভেম্বর, ২০২৫। ▫

আত্মবলিদান দিয়ে জাতিকে জাগিয়েছেন গুরু তেগবাহাদুর

ধর্মরক্ষার জন্য গুরু তেগবাহাদুরের জীবনদান হিন্দু সমাজে চৈতন্যের সৃষ্টি করেছিল। 'পঞ্চনদের তীরে বেনী পাকাইয়া শিরে, দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ, নির্মম নির্ভীক'— শুধু পঞ্চ নদের তীরে নয়, সমগ্র ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সমগ্র সমাজ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো— প্রতিজ্ঞা করলো শির দেঙ্গে, সার নেহি দেঙ্গে।

শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল

ধর্মগুরু, সন্ন্যাসী, সাধক যাঁরা যুগে যুগে দেশকে জাগিয়েছেন, ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সমাজকে সচেতন করেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন— এই পরম্পরার উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন নবম শিখগুরু তেগবাহাদুর।

পুণ্যভূমি, স্বর্ণভূমি, জ্ঞান বিজ্ঞান গর্বিত এই ভারতভূমি হাজার বছর ধরে বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তার বীরপুত্ররা সতত সংঘর্ষের দ্বারা দেশ, সমাজ, সংস্কৃতিকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছেন। এই সংঘর্ষের প্রেরণা দিয়ে এসেছেন ভারতের মহান সাধু-সন্ন্যাসী সমাজ। গ্রিক আক্রমণ দিয়ে শুরু হলেও শক, হুন, মোগল পাঠানদের মধ্যে মোগল শাসনকাল ছিল ভয়াবহ ও নৃশংস। মন্দির ধ্বংস হয়েছে, মূর্তি ভাঙা হয়েছে, মা-বোনের সম্মান নষ্ট হয়েছে, প্রকাশ্য স্থানে গোহত্যা হয়েছে, তিলক-উপবীত ধারণে বাধা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাঁচার জন্য রাজস্ব বা কর দিতে হয়েছে যা জিজিয়া কর নামে কুখ্যাত। এমনই এক ঘোর অন্ধকার মুহূর্তে সমাজকে সাহস জোগাতে এগিয়ে এসেছিলেন প্রেরণাপুরুষ গুরু তেগবাহাদুর।

পঞ্জাবের অমৃতসরে বৈশাখ কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে ১৬৭৮ বিক্রম সংবৎ, ইংরেজি ১৬২১ সালের ১ এপ্রিল গুরু তেগবাহাদুরের জন্ম। বাবা গুরু হরগোবিন্দ এবং মা নানকী দেবী। শৈশবের নাম ত্যাগমল। কিন্তু তার সাহস, পরাক্রম, সমরকুলতা বিশেষ করে দুই হাতে তলোয়ার চালানোর পারদর্শিতায় খুশি হয়ে বাবা তাঁর নাম রাখেন তেগবাহাদুর। পুত্রের মতো পিতা গুরু হরগোবিন্দ ছিলেন সন্ত সৈনিক; যিনি ধর্মরক্ষার জন্য গুরু পরম্পরার মধ্যে প্রথম অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, ছোটো ছোটো

সেনাবাহিনী তৈরি করে স্থানে স্থানে জাহাঙ্গির ও শাজাহানের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচারের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনই একজন বীর ও ধার্মিক পিতার পুত্র ছিলেন তেগবাহাদুর। তিনি চার ভাই, এক বোনের মধ্যে সবার ছোটো ছিলেন তিনি।

গুরু হরগোবিন্দের পর শিখপন্থের নবম গুরু হয়েছিলেন তেগবাহাদুর ১৬৬৫ সালের ২০ মার্চ। ওই সময় হিন্দুদের পরিস্থিতি ছিল ভয়ংকর; ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল— সরকারি ফরমান ছিল মূর্তিপূজা করা যাবে না, জিজিয়া কর দিতে হবে। কাশী বিশ্বনাথ থেকে শুরু করে একে একে বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস হতে দেখা গেল। উদ্দেশ্য একটাই, হিন্দুদের মনে হীনম্মন্যতা ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা। হিন্দুদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা। হতাশাগ্রস্ত, ভীতসন্ত্রস্ত হিন্দুসমাজকে সাহস জোগাতে, সংগ্রামুখী করতে ক্রমাগত ভ্রমণ শুরু করলেন গুরু তেগবাহাদুর। কাশ্মীর থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, বঙ্গ, অসম— ভারতের ইসলামি উপদ্রুত সকল স্থানে শিষ্যদের একত্রিত, সংগঠিত করে তাদের সাহস দিলেন, ধর্মের শিক্ষা দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষরোপণ, কূপখনন অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা চালু রাখার পরামর্শ দিলেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ ও অসমে ভ্রমণকালে একটি বড়ো ঘটনার নিষ্পত্তি হয়েছিল গুরু তেগবাহাদুরের মধ্যস্থতায়। সেটি হলো বঙ্গের রাজা রাম সিংহ এবং অসমের রাজা চক্রধ্বজের মধ্যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি। সেই বছরই পাটনা সাহিবে তার সেই বিখ্যাত পুত্রের জন্ম হয়, যিনি পরবর্তীকালে দশম গুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন— গুরু গোবিন্দ সিংহ। ছোটো থেকেই তার মধ্যে একটা বীর ভাব ছিল যেমনটা ছিল তার পিতৃদেবের। শাস্ত্রের সঙ্গে শুরু হলো শস্ত্রের শিক্ষা।

১৬৭৫ সালে কাশ্মীরের হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবন বিপন্ন; ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে, না হলেই চলছে অত্যাচার। এমতাবস্থায় কাশ্মীরের একদল পণ্ডিত শ্রীকৃপারামের নেতৃত্বে গুরু তেগবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে সেখানকার পরিস্থিতি সবিস্তারে অবগত করালেন এবং এর পরিত্রাণের উপায় জানতে চাইলেন। সব শুনে গুরু তেগবাহাদুর বললেন, এই মুহূর্তে ঈশ্বর একজন পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের বলিদান চাইছেন, যাঁকে ধর্মের জন্য আত্মবলিদান দিতে হবে। পাশে দণ্ডায়মান নয় বছরের বালক পুত্র গোবিন্দ রায় বললেন— এই মুহূর্তে আপনার মতো পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ আর কে আছেন? পুত্রের এই বক্তব্যকে ঈশ্বরের ইচ্ছা মনে করে গুরু তেগবাহাদুর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের, এই বলে ফিরে যেতে বললেন যে এবং মোগল শাসকরা যদি গুরু তেগবাহাদুরকে ধর্ম পরিবর্তন করাতে পারে তবে তারা সবাই ধর্মত্যাগ করবে তা না হলে তাদের এই অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

কাশ্মীরের শাসক ইফতিরখান পণ্ডিতদের মুখে সেই বার্তা শোনার পর দিল্লির দরবারে তা জানায়। দিল্লির দরবার অতি শীঘ্র গুরু তেগবাহাদুরকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। গুরু তেগবাহাদুর তার আগেই নিজে থেকে দিল্লি রওনা দিলেন, সঙ্গে চললেন তিন শিষ্য— ভাই মোতি দাস, ভাই সতী দাস ও ভাই দয়াল দাস। তার আগে বালক পুত্র গোবিন্দকে দশম শিখ গুরুপদে অভিষিক্ত করে সমস্ত দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন, কারণ তিনি জানতেন তাঁর আর ফিরে আসা হবে না।

দিল্লিতে ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম স্বীকার করানোর জন্য নানা ভাবে ভীতি প্রদর্শন করানো হলো। কিন্তু কোনো ভাবেই তাঁর মনোভাব ভাঙা গেল না। তার চোখের সামনে তার তিন প্রিয় শিষ্যকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। প্রথমে ভাই মোতি দাসকে করাত দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত চিরে ফেলা হলো; রক্তের ধারা বইতে লাগল কিন্তু গুরুদেব নির্বিকার। এরপর ভাই দয়াল দাসকে একটি বিশালপাত্রে ফুটন্ত জলে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হলো; গুরুদেব তখনো শান্ত। সবশেষে সতী দাসকে সমস্ত শরীরে তুলো জড়িয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো। এত অত্যাচার, নৃশংসতা গুরু তেগবাদুরকে টলাতে পারলো না। এরপর বাদশাহের নির্দেশে প্রকাশ্যে তাঁকে হত্যার জন্য দিল্লির চাঁদনীচকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো; হিন্দুদের মনে ভীতি সঞ্চয়ের জন্য আগাম ঘোষণা করা হলো যাতে তারা হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে। দিনটা ছিল ২৪ নভেম্বর ১৬৭৫ সাল, গুরু তেগবাহাদুর প্রাতঃকালে স্নান করলেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেন। তাঁকে লোহার খাঁচায় বন্দি করে চাঁদনীচকে আনা হলো। হাজার হাজার মানুষ— হিন্দু নরনারী, শিষ্য, ভক্ত— সবার মনে কৌতূহল, আশঙ্কা, বেদনা। তিনি শান্ত, নির্বিকার। একটি বৃক্ষের নীচে তাকে বসানো হয়েছিল। শুধু তার ইচ্ছাতে কিছু লেখন সামগ্রী আনানো হলো— একটা কাগজে কিছু লিখলেন এবং তার পাগড়ির মধ্যে তা রাখলেন। সবাই ভাবলো হয়তো কিছু অলৌকিক কিছু হবে। গুরু তেগবাহাদুর চোখ বন্ধ করে সমাধিস্থ হলেন। শাসকের ইশরায় জল্লাদের এক কোপে গুরুজীর মস্তক শরীর থেকে আলাদা করা হলো। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য সবার মনকে নাড়া দিল, কিন্তু একটা কৌতূহল থেকেই গেল কী লেখা আছে ওই কাগজে; বিশেষ করে মোগল রাজকর্তাদের। কাগজ খুলে দেখা গেল বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে— 'শির দিয়া লেকিন সার নহী দিয়া'। শ্রীগুরু মহারাজের এই বার্তা বিদ্যুৎবেগে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়লো যে, জীবন দেবো। কিন্তু ধর্ম দেবো না। গুরু তেগবাহাদুর আত্মবলিদান দিয়ে দেশবাসীকে বোঝালেন এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের কী কর্তব্য।

ওইদিন ওই সময় তেগবাহাদুরের হত্যার পর ভিড়ে হুড়োহুড়ির মধ্যে এক শিষ্য ভাই জৌতা গুরুদেবের ছিন্নশির কাপড়ে জড়িয়ে অতন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে দশম গুরু বালক গোবিন্দ সিংহকে প্রদান করেন। ধর্মের জন্য জীবনদানকারী সেই মহান পিতার মস্তক বুকে ধারণ করে চুম্বন করলেন, প্রণাম করলেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তার অন্তিম সংস্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের নিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এই সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য জীবন বলিদানকারী একটি যোদ্ধা খালসাবাহিনী তৈরি করবেন। অন্যদিকে দিল্লিতে গুরু তেগবাহাদুরের মস্তকহীন শরীর অংশ পড়ে রইল; কেউ সাহস করছে না সিপাহিদের পাহারার মধ্যে কিছু করার। এক শিষ্য লক্ষ্মীশাহ অনেকগুলি গোরুর গাড়িতে তুলো ভরতি করে ওই পথে যাওয়ার সময় সিপাহিদের অসতর্কতার মুহূর্তে গুরুজীর শরীর গাড়ির তুলোর মধ্যে লুকিয়ে এনে নিজের বাড়িই আগুন ধরিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন এই বলে— আগুনে আমার সব শেষ হয়ে গেল, আমি এখন কী করবো। সবাই ভাবলো লক্ষ্মীশাহের বাড়ি আগুনে পুড়ে তার ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল।

ধর্মরক্ষার জন্য গুরু তেগবাহাদুরের এই জীবনদান হিন্দু সমাজে চৈতন্যের সৃষ্টি করেছিল। 'পঞ্চনদের তীরে বেনী পাকাইয়া শিরে, দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল শিখ, নির্মম নির্ভীক'— শুধু পঞ্চ নদের তীরে নয়, সমগ্র ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সমগ্র সমাজ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো, প্রতিজ্ঞা করলো— শির দেঙ্গে, সার নেহি দেঙ্গে। □

শিখ গুরু পরম্পরা এবং গুরু তেগবাহাদুর

রবি রঞ্জন সেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বন্দী বীর’ কবিতায় লিখেছেন—

‘পঞ্চ নদীর তীরে
বেণী পাকাইয়া শিরে
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠিছে শিখ্—
নির্মম নির্ভীক।’

৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যে নিরন্তর ইসলামি সামরিক অভিযান ও হামলা চলতে থাকে তার ফলে সাধারণ মানুষের উপর ক্রমাগত অবর্ণনীয় অত্যাচার ও নিপীড়ন ঘটে চলে। মহম্মদ বিন কাশিম, মাহমুদ গজনবি, মহম্মদ ঘুরী, বাবর প্রভৃতি তুর্কি-পাঠান-মুঘল হামলাকারীদের পরের পর আক্রমণ ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ধর্মের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। তবুও, পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতা কয়েক দশকের মধ্যে নির্মূল হয়ে গেলেও, ভারত তার নিজস্ব পরিচয়কে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে সবরকম ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে। যে সমস্ত মহামানবদের জন্য ওই অসাধ্য সাধন হয়েছে, প্রবল আসুরিক শক্তিকে প্রতিরোধ করেও ওই সভ্যতা তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিখ গুরু পরম্পরা এবং তাঁদের শিষ্যবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই ‘নির্মম নির্ভীক’ শিখপন্থের প্রতিরোধ যদি জেগে না উঠত, তাহলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ইসলামীকরণ ঘটত যার ফলে বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক সীমান্তও সঙ্কুচিত হতো, ভারত-পাকিস্তানের সীমানা চলে আসত নিকটে।

মধ্যযুগের ক্রমাগত জেহাদি আক্রমণগুলির ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৎকালীন পঞ্জাবপ্রদেশ। যতবার হামলা হয়েছে ততবারই একদা বৈদিক ঋষিদের ভূমি পঞ্জাবের অধিবাসীদের পিপীলিকার মতো পিষে দিয়েছে। বাবরের আক্রমণের সাক্ষী প্রথম শিখ গুরু নানকদেব তিনি তাঁর ‘বাবররাণী’তে মুঘলদের দ্বারা ঘটিত নির্দ্বিধায় গণহত্যা, বন্দি ও ধর্ষণের বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষের দুর্দশা তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ করেছিল। মুঘলদের তিনি ‘মৃত্যুর দূতরূপে উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের উপর পূজা-তীর্থস্নান-তিলক ধারণের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা তিনি ওই আক্রমণ সম্বন্ধে চারটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন যা ‘বাবরবাণী’ নামে গুরু গ্রন্থসাহিবে অন্তর্ভুক্ত।

সেই সময়কালে যখন একদিকে হিন্দু সমাজ আক্রমণকারীদের সঙ্গে মরণবাঁচনের লড়াইয়ে কোণঠাসা, তখন সমাজকে নতুন মনোবল জুগিয়েছে ও ঐক্যবদ্ধ করেছে ভক্তি আন্দোলন। ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞের পরিবর্তে সহজ সরল ভক্তিমার্গ সারা দেশে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত ও জাগরিত করেছে। জাতি-বর্ণের বিভাজন অতিক্রম করে সুসংহত সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন ভক্তি প্রচারকরা। মহারাষ্ট্রে একনাথ-নামদেব-তুকারাম; রাজস্থানে দাদু; বঙ্গপ্রদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; পঞ্জাবে গুরু নানক প্রভৃতি প্রচারকরা বৈদিক হিন্দু ধর্মেরই বার্তা সহজ সরলভাবে সাধারণ মানুষের ভাষায়, মানুষের কাছে নিয়ে আসেন। এর ফলে দেশের মানুষের মধ্যে মানসিক বল ও আত্মবিশ্বাস জাগরিত হয়।

গুরু নানকদেব
(১৪৬৯-১৫৩৯)

ভাণ্ড চাকো, কীরত করো, নাম জপো (অর্থাৎ দান কর, কীর্তি/কর্ম কর ও নামজপ কর)— এই তিনটি সহজ বিধান মানুষকে দিয়েছিলেন। তিনি মানুষের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজক-রূপে দীর্ঘ যাত্রা করেছেন। শিখ নথি অনুযায়ী তিনি চারটি দীর্ঘ যাত্রা করেছিলেন যেগুলিকে ‘উদাসী’ বলা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ-সহ শ্রীলঙ্কা, পশ্চিম এশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে গিয়েছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেমন ঢাকা, কলকাতা প্রভৃতি তিনি এসেছিলেন যেখানে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত গুরুদ্বার পরবর্তীকালে নির্মাণ করা হয়েছে, যেমন কলকাতার বর্তমান বড়বাজারে অবস্থিত গুরুদ্বার বড়ো শিখসঙ্গত। এই ‘উদাসী’ কালে তিনি অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির দর্শন করেছিলেন যা তাঁর ‘জনমসাখী’ (জন্মসাক্ষী)-তে উল্লেখ রয়েছে। বর্তমানকালের

শ্রীরামজন্মভূমি সংক্রান্ত মামলায় তাঁর এই দর্শনের সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়েছিল যা তৎকালীন মন্দিরের অস্তিত্ব বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি বলে বিবেচিত হয়। পঞ্জাব ও অন্যান্য অঞ্চলে গুরু নানকের ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে সংগঠিত হতে শুরু করে এবং তাঁর রচিত প্রায় এক সহস্র গীত বা 'শব্দ' তাঁর বাণীকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। এই নানকপন্থী সম্প্রদায়কে নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর ভক্ত ভাই লেহ্‌নাকে 'অঙ্গদ' নামকরণ করে তাঁর উত্তরসূরী মনোনীত করে যান। গুরু নানকের দেহাবসানের পর গুরু অঙ্গদ দ্বিতীয় শিখ গুরুরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

গুরু নানক এবং তাঁর উত্তরসূরীরা কোনো নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করেননি বরং বৈদান্তিক হিন্দু ধর্মকে সহজ সরল রূপে মানুষের কাছে তুলে ধরে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকেই বলপ্রদান করেছিলেন। কবীর ও দাদুর মতোই বেদান্ত-দর্শন থেকে উৎপন্ন নির্গুণ সন্তমতকে তিনি তাঁর বাণীর মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদেব পঞ্জাবি ভাষার সংস্কার ঘটান, গুরমুখী লিপির প্রচলন করেন এবং গুরুনানক-প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গত' বা নিঃশুল্ক পঙ্‌ক্তিভোজন ব্যবস্থাকে আরও প্রসারিত করেন। তৃতীয় গুরু অমর দাস নব্য-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে সাংগঠনিক রূপ প্রদান করার জন্য মীরী ও পীরী প্রথা চালু করেন যার অন্তর্গত ৯৪ জন পুরুষ ও ৫২ জন মহিলাকে ধর্ম প্রচারক নিযুক্ত করা হয়। ওই ব্যবস্থার মাধ্যমে সমস্ত নানকপন্থীদের একত্রিত রাখা সম্ভব হয়েছিল।

চতুর্থ শিখ গুরু রাম দাস (১৫৩৪-১৫৮১) অমৃতসর নগর প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে শিখদের প্রধান পবিত্রস্থল রূপে গড়ে ওঠে। পঞ্চম গুরু অর্জুন দেব (১৫৬৩-১৬০৬) 'আদি গ্রন্থ' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ও অমৃতসরে হরমন্দির সাহিব বা 'দরবার সাহিব' (বর্তমানে স্বর্ণ মন্দির) নির্মাণ করেন।

এই সময়ের মধ্যে নানকপন্থীরা যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং পঞ্জাবের ইসলামীকরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুঘল বাদশা জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী মুঘল বংশজকে সমর্থন করার অজুহাতে গুরুকে বন্দি করেন এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করার ফলে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার করে অবশেষে তাঁকে হত্যা করা হয়। গুরু অর্জুনদেবের এই আত্মবলিদান শিখপন্থের ইতিহাসে একটি নতুন মোড় নিয়ে আসে যেখানে তারা প্রত্যক্ষভাবে মুঘল রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে শিখ সম্প্রদায় প্রথম তিন-চার পুরুষ পর্যন্ত 'দোকান গরম রেখেছে' এবং তার পর তারা শুধু সাধারণ হিন্দু নয় এমনকী মুসলমানদেরও আকৃষ্ট করছিল ও সংখ্যাবৃদ্ধি করছিল। ফলে গুরু অর্জুনকে ইসলাম গ্রহণ করানো তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে শিখ সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই নির্মম হত্যার ফলাফল হলো ঠিক বিপরীত। মৃত্যুর পূর্বেই গুরু অর্জুন তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী গুরু হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণ করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন। তাঁর এই বলিদানের ফলে একটি নিরীহ ভক্তসম্প্রদায় হয়ে ওঠে 'নির্মম নির্ভীক', যা পরবর্তীকালে মুঘল শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

গুরু হরগোবিন্দ অমৃতসরে 'অকাল তখ্‌ত' নির্মাণ করেন এবং সেটিকে শিখ রাজকীয় শক্তির কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি 'মীরী-পীরী' নীতির প্রচলন করেন অর্থাৎ বিধর্মী অত্যাচারের মুখে শিখদের কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি নয়, সামরিক শক্তি নির্মাণ করাও প্রয়োজন। এই দুটির ভারসাম্য বজায় রেখেই এই পন্থ বা সম্প্রদায় তার আত্মরক্ষা সম্পন্ন করবে। 'মীরী' অর্থাৎ জাগতিক বা রাজকীয় শক্তি যা অস্ত্রদ্বারা সাধিত হবে এবং 'পীরী' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক শক্তি যা নামজপ বা সাধনাদ্বারা অর্জিত হবে।

এই দুই ধরনের শক্তির প্রতীকরূপে তিনি তাঁর অঙ্গে দুটি তরবারি ধারণ করে গুরুর আসনে বসেছিলেন। এই দুই তরবারি ও মধ্যবর্তী খণ্ড বর্তমানে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তম গুরু হর রায় (১৬৩০-১৬৬১) ও অষ্টম গুরু হরকিষণ (১৬৫৬-১৬৬৪) তাঁদের পূর্বসূরিদের শুরু করা কাজ এগিয়ে নিয়ে যান ও সম্প্রদায়ের দৃঢ়ীকরণ ঘটান।

গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র ত্যাগমল (জন্ম ১৬২১) বালক অবস্থাতেই ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘলদের বিরুদ্ধে করতারপুরের যুদ্ধে প্রখর বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। পঞ্জাবের করতারপুরে মুঘলদের হামলা হলে শিখ যোদ্ধারা প্রবল প্রতিরোধ করে ও মুঘলদের পরাজিত করে। ১৪ বছরের ত্যাগমল মুঘল সেনাপতিকে তরবারি দ্বারা দুই টুকরো করে বধ করে। পুত্রের এই সাহস ও যুদ্ধক্ষমতা দেখে পিতা হরগোবিন্দ তাঁর 'তেগবাহাদুর' নামকরণ করেন। এই নামেই পরিচিত হয়ে ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন।

গুরু নানকের 'উদাসী'র পদানুসরণ করে গুরু তেগবাহাদুর উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সর্বত্র তিনি লঙ্গর এবং পানীয় জলের কূপ প্রবর্তন করেন যেগুলি জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ব্যবহার্য অর্থাৎ সামাজিক সমরসতা ও সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অসমের ধুবড়িতে তাঁর নামাঙ্কিত বিখ্যাত গুরুদ্বার রয়েছে যেখানে তিনি পদার্পণ করেছিলেন। এছাড়াও ঢাকা-সহ বঙ্গ, বিহার, মথুরা, আগ্রা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি ধুবড়িতে থাকাকালীন তাঁর পুত্র গোবিন্দ রায় পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন যিনি পরবর্তীতে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ হয়েছিন। এই সময়ে হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচারের খবর পেয়ে তিনি পঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় যাত্রা করেন অত্যাচারিত মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে।

মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের উপর ধর্মান্তরণের জন্য অভূতপূর্ব নিপীড়ন নেমে আসে। বলা হয় যে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত পণ্ডিতদের পরিত্যক্ত উপবীত গোরুর গাড়ি বোঝাই করে দিল্লি প্রেরণ করা হতো। এই অবস্থা

পঞ্চ প্যারে

থেকে পরিত্রাণের জন্য কাশ্মীরি পণ্ডিতরা অমরনাথ মন্দিরে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করেন। বলা হয় যে সেখানে একজন পণ্ডিত স্বপ্নাদেশ পান নবম গুরু তেগবাহাদুরের কাছে গিয়ে তাঁকে এই বিষয়ে অবহিত করার জন্য।

১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৫০০ জন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রতিনিধি দল পণ্ডিত কৃপারামের নেতৃত্বে আনন্দপুর সাহিবে গুরু তেগবাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁদের দুর্ভোগের কথা তাঁকে অবগত করেন। সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে গুরুজী বলেন যে ওই অত্যাচারের প্রতিরোধ তখনই সম্ভব যদি কোনো মহান ব্যক্তি আত্মবলিদান দেন। ৯ বছর বয়সি বালক গোবিন্দ রায় বলেন যে পিতা (অর্থাৎ গুরু তেগবাহাদুর) এই আত্মবলিদানের জন্য আদর্শ ব্যক্তি, কারণ তাঁর চেয়ে মহৎ অপর কেউ নেই। এই কথা শুনে গুরু উপস্থিত পণ্ডিতদের বলেন যে তাঁরা ফিরে গিয়ে ঔরঙ্গজেবকে জানান যে তিনি যদি গুরু তেগবাহাদুরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে পারেন তবে সকল পণ্ডিতরাই ইসলাম গ্রহণ করবে।

গুরু তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অত্যাচারী মুঘলদের প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে যান কিন্তু রোপরে তাঁকে বন্দি করা হয় ও প্রথমে সিরহিন্দ, তারপর দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে অথবা ইসলাম স্বীকার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি উভয় দাবিই অস্বীকার করাতে প্রথমে তাঁর তিন সঙ্গীকে তাঁর সম্মুখেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়— ভাই সতী দাসকে দুই খণ্ডে চিরে দেওয়া হয়। ভাই মোতি দাসকে ছোটো ছোটো খণ্ডে কেটে ফেলে দেওয়া হয়। তাতেও যখন গুরুর করানো সম্ভব হলো না তখন দিল্লির চাঁদনি চোকে লালকেল্লার বিপরীতে সর্বসমক্ষে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়।

পুত্র ও পরবর্তী গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর রচিত 'বিচিত্র নাটক'-এ লিখেছেন যে গুরু তেগবাহাদুর তিলক ও উপবীত রক্ষার জন্য বিনা অনুতাপে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

গুরু অনুগামীরা রাতের অন্ধকারে মুঘলদের চোখে ধুলো দিয়ে তাঁর ছিন্নশির নিয়ে আনন্দপুর সাহিব চলে গেলেন ও ধড়টিকে দিল্লির এক ভক্ত লক্ষ্মী শাহের গৃহে নিয়ে এসে সমগ্র গৃহে অগ্নিসংযোগ করে দাহকার্য সম্পন্ন করেন। অগ্নিসংস্কারের এই স্থানেই আজ গুরুদ্বার রকাবগঞ্জ অবস্থিত ও শিরশ্ছেদের স্থানে গুরুদ্বার সীসগঞ্জ অবস্থিত। দিল্লির এই গুরুদ্বারগুলিতে গেলে আমরা বলিদানের সেই পবিত্র স্থানগুলি এবং এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে লেখা বিবরণ দর্শন করতে পারব।

গুরু তেগবাহাদুরের হত্যার পর দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে খালসা ফেজি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিখ-মুঘল যুদ্ধের ফলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুঘল সাম্রাজ্য কেঁপে ওঠে। রাজপুত-মারাঠা-জাট-বুন্দেলা প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শিখ প্রতিরোধ মুঘল সাম্রাজ্যকে ছায়ায় পরিণত করে যা অবশেষে মারাঠাদের প্রদত্ত মাসোহারায় দিনযাপন করতে বাধ্য হয়।

এ বছর গুরু তেগবাহাদুরের চরম বলিদানের ৩৫০তম বর্ষপূর্তি। সারা ভারতবর্ষ এবং সমগ্র হিন্দু সমাজ শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এই নবম গুরুকে যিনি 'তিলক ও উপবীত' অর্থাৎ হিন্দুর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন; এবং সেই প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করেছিলেন। □

মানব সম্পদের মতো বিষয় উপেক্ষিত পশ্চিমবঙ্গে

অজয় ভট্টাচার্য

একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। যেখানে অপরাধীর কোনো শাস্তি নেই। শিক্ষা নেই, শিষ্টাচার নেই। বড়োদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নেই। পারস্পরিক বিশ্বাস নেই। পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে ভালোবাসা নেই। অপরাধ করা সত্ত্বেও অপরাধীকে তিরস্কারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বরং পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধ পরবর্তীতে অপরাধীর পদোন্নতি হয়। বুঝিয়ে দেওয়া হয় সব অভিযোগ সাজানো। সবই কেন্দ্রের শাসক দলের কারসাজি। সময়মতো চার্জশিটের অভাবে ছাড়া পাচ্ছে ছোটো-বড়ো অপরাধীরা। এমনকী হত্যা ও ধর্ষণ করেও ছাড় পাওয়া যায়। আবার তাঁরাই সমাজসেবী নাম ধরে মঞ্চে প্রধান অতিথির চেয়ার অলংকৃত করে বসে থাকেন। যা নিঃসন্দেহে অপরাধপ্রবণতায় উৎসাহ জোগায়। অপরাধপ্রবণ মানুষদের অপরাধ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। যার পরিণামে অপরাধীদের দ্বারা ভরে উঠছে চারপাশ। আর একদল মানুষ ভাতাজীবী হয়ে মুখ বুজে সয়ে নিচ্ছেন সব।

শাস্তিহীনতার বরাভয় পকেটস্থ হলে কী হতে পারে তা দেখিয়ে দিয়েছে কসবা ল' কলেজের গণধর্ষণ কাণ্ড। সাধারণ মানুষের অভিমত যে, কামদুনি বা আরজি কর কাণ্ডে জড়িত অপরাধীদের যদি যথাসময়ে ঠিকঠাক সাজা দেওয়া যেত, তবে কসবা ল' কলেজের গণধর্ষণ কাণ্ডের মতো ঘৃণ্য অপরাধ ঘটতে পারত না। অথচ কী আশ্চর্য, বেমালুম চেপে দেওয়া হলো আরজি কর কাণ্ডের যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ। যার ফলে খুন-ধর্ষণের পিছনে আসলে কারা ছিলেন, তা আজও জানা গেল না। যারা তথ্য লোপাটে ও ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন তাদেরও ধরা হয়নি আজও। জমা পড়েনি পরবর্তী চার্জশিটও। তারপরও লোক দেখানোর জন্য রাজ্যের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি আনা হয়েছিল অপরাজিতা বিল।

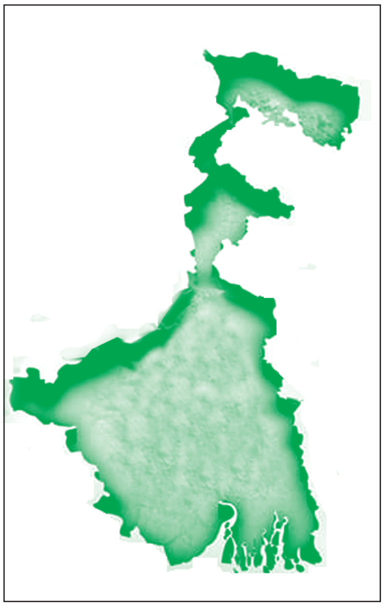

অথচ কোনো এক ধর্ষিতা মূক ও বধির কন্যার বিচার চাইতে একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সটান ঢুকে পড়েছিলেন মহাকরণের অন্দরমহলে। অভিযোগ ছিল, চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিঁচড়ে মহাকরণ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল তাকে। জননেত্রীর এহেন সম্ভ্রমহানির ঘটনায় সমস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সকলে। অথচ ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর নিয়তি, আজ তিনিই এ-রাজ্যের শাসক, আর তাঁরই শাসনে তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ দুর্বৃত্তদের হাতে নির্যাতিত হতে হচ্ছে তাঁরই মতো আরও কত নারীকে। নিষ্ঠুরতায় ও বর্বরতায় তৃণমূল আশ্রিত দুর্বৃত্তরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের 'ভিখু' চরিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। আসলে শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকার বিনিময়ে অপরাধ করা সত্ত্বেও যদি শাস্তি এড়িয়ে যাওয়া যায় তাহলে অপরাধীর অপরাধের মাত্রা দিন দিন বাড়তেই থাকে। তারই ফলশ্রুতিতে 'মনোজিৎ'-এর মতো অপরাধীদের বাড়বাড়ন্ত। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা'। আঁধার এসেছে এপার-ওপার দুই বঙ্গেতেই। নারীর নিরাপত্তা নেই। সন্তান বাড়ি ফিরবে কিনা তারও নিশ্চয়তা নেই। একবার কলেজ ইউনিয়নের দাদাদের নজরে পড়ে গেলেই তার কপাল পুড়তে শুরু করে। কলেজের প্রিন্সিপালও এই দাদাদের ভয়ে ত্রস্ত থাকে। তাদের কথা না শুনলে শাস্তির খাড়া নেমে আসে। ক্ষমতার দাদাগিরির আস্ফালন বলে, প্রতিপক্ষ হোক বা প্রার্থিত, যে কোনো উপায়ে তার ঘাড় নুইয়ে দাও।

তবে রাজ্যে নারীনিগ্রহের বৃহৎ চিত্রটির ডালপালা হয়তো আরও অনেক দূর বিস্তৃত। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে জনজোয়ার সত্ত্বেও হুমকিতন্ত্রের দিব্যি বহাল থাকা, মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ত্রাসের রাজত্ব অব্যাহত থাকা, কসবা ল' কলেজের গণধর্ষণ কাণ্ড, তারই প্রমাণ দেয়। সেক্ষেত্রে আরজি কর কাণ্ড, আইন কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ড অপরাধের হিমশৈলের চূড়ামাত্র হতে পারে। তাই এরকম ছোটো বড়ো 'মনোজিৎ মিশ্র', আরও কত যে আছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এর পর অভিভাবকরা কোন ভরসায় ছেলে-মেয়েদের কলেজে পাঠাবেন, তা এক বিরাট প্রশ্ন। এমনীতেই কর্মহীন পশ্চিমবঙ্গে কলেজগুলির অধিকাংশ আসন ফাঁকা থাকছে। সাধারণ বিভাগে কেউ আর পড়তে চাইছে না। তার উপর নিরাপত্তার অভাব। কলেজে ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি। চাঁদার জলুম। শিক্ষান্তে কাজ নেই। সবমিলিয়ে শিক্ষার্থীরা দিশাহীন। অথচ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মানব সম্পদের মতো বিষয়গুলো রাজ্য তথা দেশের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি, যা সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সরকারি হাসপাতাল, সরকারি স্কুল রাতারাতি লাভজনক সংস্থায় রূপান্তরিত করার ফলে মানব সম্পদের মতো বিষয়গুলো ক্ষুণ্ণ হতে বসেছে এ-রাজ্যে। □

বাংলাদেশে ১০ কোটি মানুষ হারিয়ে গেছে

শিতাংশু গুহ

একটি বিষয় এই প্রতিবেদকের বোধগম্য হচ্ছে না। সেটি হলো ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩০ লক্ষ। তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৫০ লক্ষ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ। এই পরিসংখ্যানটি গুগলে পাওয়া যায়। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ, তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২৮ লক্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তানের ৫ কোটি লক্ষ। অনেকেরই মনে আছে যে, ১৯৭১ সালে মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সাড়ে ৭ কোটি বাঙ্গালিকে দাবায়ে রাখতে পারবা না!' সোজা অঙ্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটি, তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল সাড়ে ৭ কোটি মানুষ, পশ্চিম পাকিস্তানে সাড়ে ৫ কোটি।

বাংলাদেশে ২০২২ সালে জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি (১৬ কোটি ৯৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৯২১ জন)। পাকিস্তানে ২০২৩ সালের জনগণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি (২৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৩১ জন। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট-বাল্টিস্তানের জনসংখ্যাকে এই জনগণনায় ধরা হয়নি)। ভাবনার বিষয় হলো, ১৯৭১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত পাকিস্তানের জনসংখ্যা সাড়ে ৫ কোটি থেকে বেড়ে ২৫ কোটি হলে একই সময়ে (১৯৭১-২০২২) বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে ৭ কোটি থেকে বেড়ে মাত্র ১৭ কোটি হয় কী করে? এটি কি কোনো কিছুর ইঙ্গিত দেয়?

সাধারণ গণিতে হিসাবমতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হওয়া উচিত—২৫ x ৭.৫/৫.৫ = ৩৪ কোটি। আরও সহজভাবে দেখলে দেখা যাবে পাকিস্তানের জনসংখ্যা প্রায় ৫ গুণ বেড়েছে। বাংলাদেশেও ৫ গুণ বাড়লে সংখ্যাটি ৩৪ কোটিরও বেশি দাঁড়ায়। জন্ম-মৃত্যুর হার, ফ্যামিলি প্ল্যানিং, বহুবিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারগুলি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে প্রায় সমান। প্রশ্ন হলো বাংলাদেশে জনসংখ্যা বর্তমানে ১৭ কোটি, থাকার কথা ৩৪ কোটি। তাহলে বাকি ১৭ কোটি মানুষ কোথায় গেল? বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ প্রবাসী, তাঁরা বিদেশে থাকেন। বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫ কোটি হিন্দু এই সময় বিতাড়িত হয়েছে। ১৯৭১ সালে প্রায় ১ কোটি হিন্দু ভারতে গিয়েছে। তখন বাংলাদেশে বা এদিক- ওদিক হিসাবের বাইরে প্রায় ৫০ লক্ষ হিন্দু, অর্থাৎ মোট দেড় কোটি হিন্দু ছিল। সেই জনসংখ্যা ৫ গুণ বাড়লে তা দাঁড়াত সাড়ে ৭ কোটি। বাস্তবে বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ২ কোটি (সরকারি হিসাবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ) হিন্দু। তো বাকিরা কই?

তাহলে দাঁড়াল ১৭+২+৫=২৪ কোটি।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা আসলে ১৭ কোটির বেশি, প্রায় ২০ কোটি। তাও যদি হয়, তাহলেও ৫-৭ কোটি মানুষের খবর নেই কেন? হিসাবের খাতায় তাঁরা নিখোঁজ। প্রশ্ন হলো, তাঁরা কি সত্যিই নিখোঁজ?

তাহলে ৩৪−২৪=১০ কোটি মানুষ গেল কোথায়? সংখ্যাটি যদি আরও কমিয়ে ধরা হয়, তাহলেও ৬-৭ কোটি মানুষের হদিশ নেই। এঁরা কি সবাই নিখোঁজ? এরা কি সবাই ভারতে গেছে? বা নেপালে? মায়ানমারে? মালয়েশিয়ায়? ইউরোপে? আমেরিকায়? কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায়? বোঝার সুবিধার জন্য আরও কয়েকটি তথ্য দেওয়া যাক। বাংলাদেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ। পাকিস্তানে ২.১ শতাংশ। বাংলাদেশে পুরুষদের গড় আয়ু ৭৩ বছর, পাকিস্তানে যা ৬৫ বছর। বাংলাদেশের মহিলাদের গড় আয়ু ৭৬ বছর, পাকিস্তানে যা ৭০ বছর। বাংলাদেশে জন্মহার ২০.৪ শতাংশ, পাকিস্তানে ২৭.৮ শতাংশ। বাংলাদেশে মৃত্যুহার ৫ শতাংশ, পাকিস্তানে ৬.৫ শতাংশ। একমাত্র জন্মহার বাদে বাকি সকল পরিসংখ্যানের কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা পাকিস্তানের চেয়ে ঢের বেশি হওয়ার কথা। তা হয়েছে কি? এই লোকগুলি কি সত্যিই হারিয়ে গিয়েছে?

বাংলাদেশে বিরাট সংখ্যক মানুষ নিখোঁজ, ভারতে মুসলমান হু হু করে বাড়ছে— এর মধ্যে কি কোনো যোগসূত্র রয়েছে? সম্প্রতি বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশিকে পুশব্যাক করেছে ভারত। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, এনিয়ে তাদের কিছু করার নেই। টেলিভিশনে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ফিরে আসা মানুষগুলো সবিস্তারে জানাচ্ছে যে, বাংলাদেশে কোথায় তাদের বাড়িঘর, কখন তারা ভারতে যায়, কেন সেখানে থেকে যায় ইত্যাদি। কেউ কেউ বলতে চাইছেন যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা আসলে ১৭ কোটির বেশি, প্রায় ২০ কোটি। তাও যদি হয়, তাহলেও ৫-৭ কোটি মানুষের খবর নেই কেন? হিসাবের খাতায় তাঁরা নিখোঁজ। প্রশ্ন হলো, তাঁরা কি সত্যিই নিখোঁজ? ঠিক কী হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে? □

ফঃ ৩

রাজ্যের শাসক দল এবার মৃত্যুর কারণ হিসেবে হয়তো এসআইআর রোগ লেখার জন্য নির্দেশ দেবে

বিশ্বপ্রিয় দাস

করোনা মহামারীর সময় করোনা আক্রান্ত রোগীদের ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হতো— 'কোভিড পজিটিভ'। এ বছর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো কারণে কারুর মৃত্যু ঘটলে হয়তো মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকবে— 'এসআইআর পজিটিভ'। অনেকেই বলছেন যে, শাসক দলের চাপে ডাক্তারবাবুরা হয়তো এরকম কিছু লিখতে বাধ্য হবেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে কোনো অপঘাতে মৃত্যু ঘটলেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তকমা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে যে, এসআইআর আতঙ্কে ওই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। একাধিক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে শাসক দলের পক্ষ থেকে যে এই অপপ্রচার চলছে বিভিন্ন ঘটনায় তা স্পষ্ট হয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই আতঙ্কে আদৌ কেউ আত্মঘাতী হয়ে থাকলে, সেই সব অঞ্চলে এই আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে শাসক দলই। দলীয় প্রচারযন্ত্র ছাড়াও রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনপুষ্ট সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে বারে বারে একই কথা বলে চলেছে শাসক দল, যেটা পুরোটাই মিথ্যা প্রচার। নিয়মিত রাজ্য সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার কারণে এই ধরনের ভুয়ো খবর সম্প্রচারের বিশেষ দায় রয়েছে এই পত্রপত্রিকা এবং বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের। অথচ অনুপ্রবেশকারী বাদ দিয়ে কোনো বৈধ নাগরিকের মৃত্যু যদি এসআইআর আতঙ্কে হয়ে থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে একমাত্র ও প্রধান দোষী হলো তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা। তাদের ক্রমাগত উস্কানিতে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) আক্রান্ত হয়েছেন; বিরোধী দলের বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-কে জুতোর মালা পরানো থেকে মারধোর পর্যন্ত করা হয়েছে। ভোটের সময় বুথে যেমন কোনো বিরোধী এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয় না, তেমনই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজে বিএলও-র সঙ্গী হিসেবে বিরোধী দলের বিএলএ-দের থাকতে না দেওয়া রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করার একটি প্রক্রিয়া মাত্র। রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে এই পন্থা নিয়েছে শাসক দল। বিরোধীশূন্য রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে গিয়ে রাজ্যে শাসক দল ভুলে যাচ্ছে যে, এখন পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টেছে। শাসক দলের নিয়ন্ত্রণে অনেক কিছুই নেই। তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের আচরণের বিরুদ্ধে ওই দলের মধ্যেই নানা হুঙ্কার শুরু হয়েছে। অনেকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হচ্ছে নানা ক্ষোভ-অসন্তোষ। এই ধরনের অনেক ইস্যু তৈরি করতে গিয়ে এরা একেবারেই ল্যাজে-গোবরে হয়েছে। এমনকী এই ইস্যুগুলি সাধারণ মানুষের মন ছুঁতে পারেনি। ফলে শেষ অস্ত্র হিসেবে এই এসআইআর আতঙ্ক সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে তৃণমূল।

> **তৃণমূল সুপ্রিমো এককালে রাজ্যে ঢুকে থাকা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলন থেকে তাঁর উত্থান হলেও এখন তিনি ঠিক উল্টো পথে চলছেন।**

বর্তমানে ভোটদাতাদের যে ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণের কাজ চলছে, সেখানে কোনো নথি ভোটারদের দিতে হচ্ছে না। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হলে, যাঁদের নথি দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদেরই ডাকা হবে। খুব সাধারণ কয়েকটি নথি দেখালেই নাম থেকে যাবে ভোটার তালিকায়। এই ক্ষেত্রে ১২টি নথির মধ্যে যেকোনো একটি নথির আত্মপ্রত্যয়িত ফটোকপি জমা দিলেই হবে। নথিপত্রের তালিকাটি হলো— (১) কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার বা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার নিয়মিত কর্মী বা পেনশন প্রাপকের পরিচয়পত্র বা পেনশন পেমেন্ট অর্ডার, (২) ১ জুলাই ১৯৮৭-র আগে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার/ স্থানীয় প্রশাসন/ ভারতীয় জীবনবিমা নিগম/ ডাকঘর/ ব্যাংক/ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো পরিচয়পত্র বা শংসাপত্র, (৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, (৪) বৈধ পাসপোর্ট, (৫) স্বীকৃত পর্ষদ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার শংসাপত্র, (৬) রাজ্যের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী বাসস্থানের শংসাপত্র, (৭) বনভূমির অধিকার সংক্রান্ত শংসাপত্র, (৮) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর শংসাপত্র, (৯) (যে সমস্ত ক্ষেত্রে এটি সংঘটিত হয়েছে) জাতীয় নাগরিক রেজিস্টার (এনআরসি), (১০) রাজ্য সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক তৈরি পারিবারিক রেজিস্টার, (১১) কেন্দ্র/রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জমি/বাড়ি বরাদ্দের সরকারি শংসাপত্র, (১২) আধার কার্ড (এই বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ০৯.০৯.২০২৫ তারিখে জারি হওয়া নির্দেশ, নং 23/2025-ERS/Vol.I অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে)। —এতগুলি নথির মধ্যে যে কোনো একটি থাকলেই তা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়, ঠিকানা ও নাগরিকত্বের প্রমাণ।

তৃণমূল সুপ্রিমো এককালে রাজ্যে ঢুকে থাকা অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলন থেকে তাঁর উত্থান হলেও এখন তিনি ঠিক উল্টো পথে চলছেন। তিনি অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে কথা বলছেন কারণ তার ভোটব্যাংকেরএকটা প্রধান অংশ হলো এই অবৈধ ভোটার। তিনি চাইছেন না তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাক। তার নির্দেশে রাজ্যের শাসক দল এক মরণ খেলায় নেমেছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের উচিত নয় কোনো কিছুতে ভয় পাওয়া। কেউ যদি ভারতের বৈধ নাগরিক হন, তাহলে তার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। তাই ভয় পাওয়া বা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। □

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারীরা
সমতা, সক্ষমতা ও নতুন দিগন্তের সূচনা

অরুণ রায় চৌধুরী

একসময় সেনাবাহিনীর কথা উঠলেই চোখের সামনে ভেসে উঠত— ঘাম ঝরানো গোঁফ-দাড়িওয়ালা বলশালী পুরুষরা। কাঁধে রাইফেল, বুক ফাটানো চিৎকার 'জয় হিন্দ!' আর আজ? এখন সেই চিৎকারের সুরে মিশে গেছে নারীদের গলার আওয়াজও— পরিষ্কার, দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী।

১৯৯২ সালে প্রথম যখন মেয়েদের সেনাবাহিনীতে নেওয়া শুরু হলো, তখন অনেকে সন্দেহ করেছিলেন— আরে, ওরা কি পারবে? কিন্তু আজ সেই প্রশ্নের উত্তর আকাশে ভেসে ওঠে যুদ্ধবিমানের গর্জনে, যেখানে অভানী চতুর্বেদী, মোহনা সিংহ ও ভবনাবান্ত্— ভারতের প্রথম তিন ফাইটার পাইলট হিসেবে প্রমাণ করেছেন— 'আমরাও পারি, আর কেমন পারি!'

আজ ভারতের তিন বাহিনীতেই (Army, Navy, Air Force) নারীরা নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে নারী ফাইটার পাইলটরা যেমন আকাশ জয় করছেন, তেমনি সেনাবাহিনীতেও নারীরা স্থায়ী কমিশনের (Permanent Commission) অধিকার পেয়েছেন। ক্যাপ্টেন তনুজা শর্মা সীমান্তে পাহারা দিচ্ছেন তুষারঝড়ে, আর মেজর দিব্যা আজাদ কঙ্গোতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী মিশনে উড়িয়ে চলেছেন ভারতের পতাকা। ২০২০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করে— নারীরাও পুরুষদের মতোই সেনাবাহিনীতে স্থায়ী কমিশন পাবেন। এটি শুধু একটি আইনগত পদক্ষেপ নয়, এটি ভারতের সামরিক ইতিহাসে নারী ক্ষমতায়নের এক নতুন অধ্যায়।

তবে পথটা একেবারে সহজ নয়। গ্রাউন্ড কমব্যাট বা ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটে নারীদের প্রবেশ এখনো সীমিত। শারীরিক প্রশিক্ষণ, কঠোর আবহাওয়া এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি— সব মিলিয়ে নারীরা নানা বাধার মুখে পড়েন। কিন্তু সেই বাধাকেই তাঁরা রূপান্তর করছেন সাফল্যের সিঁড়িতে। এই দৃঢ়তা, এই মানসিক শক্তিই ভারতীয় সেনাকে আরও মানবিক ও আধুনিক করে তুলছে।

আজ সেনাবাহিনীতে নারীরা শুধু 'সহযোগী' নয়, বরং নেতৃত্বের আসনে। তাঁরা কমান্ডার, পাইলট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার— সব ভূমিকাতেই উজ্জ্বল। তাঁদের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়— এটি প্রতিটি ভারতীয় মেয়ের জন্য অনুপ্রেরণার গল্প। দেশের প্রতিটি প্রান্তে নতুন প্রজন্মের মেয়েরা আজ সাহস করে বলতে পারছে— 'আমিও একদিন সেনা হব!'

ভারতীয় সেনা বাহিনীতে নারীদের যোগদান শুধু 'নারী অংশগ্রহণ' নয়, এটি এক নতুন যুগের সূচনা— যেখানে দেশরক্ষা আর পুরুষদের একচেটিয়া দায়িত্ব নয়, বরং নারী-পুরুষ উভয়ের যৌথ কর্তব্য। 'নারী শক্তি' আজ প্রমাণ করছে, তারা শুধু ঘর নয়, সীমান্তও রক্ষা করতে সক্ষম। ভবিষ্যতে সেনার মূল কমব্যাট ইউনিটেও নারীদের অন্তর্ভুক্তি হলে ভারতীয় সেনাবাহিনী হবে আরও শক্তিশালী ও আধুনিক— যা এক সত্যিকার অর্থে 'নতুন ভারতের' প্রতিচ্ছবি।

এই নতুন দিগন্তে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নারী সদস্যরা যেন জীবন্ত প্রতীক— আত্মবিশ্বাস, সাহস ও দেশপ্রেমের। তারা প্রমাণ করেছেন, দেশরক্ষার দায়িত্বে লিঙ্গ নয়, প্রয়োজন শুধু একটিই জিনিস— অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

রক্ত দূষিত হওয়া থেকে বাঁচতে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পরিবেশ ও খাবারে উপস্থিত নানাবিধ বিষাক্ত উপাদান সারাদিন ধরে প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে থাকে। আর যখন রক্তে এইসব বিষাক্ত উপাদানের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন একের পর এক রোগ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বিশেষত নানাবিধ ত্বকের সংক্রমণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই তো রক্তকে সব সময় পরিষ্কার রাখাটা একান্ত প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হলো, রক্তে ক্ষতিকর উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে কীভাবে বোঝা সম্ভব? এক্ষেত্রে প্রথমেই ব্রণর প্রকোপ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে সোরিয়াসিসের মতো রোগও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তবে এখানেই শেষ নয়, রক্ত যেহেতু শরীরের প্রতিটি কোণায়, প্রতিটি অংশে পৌঁছে যায়, তাই রক্ত যদি বিশুদ্ধ না থাকে, তাহলে কিন্তু একে একে শরীরের বাকি অংশের উপরও তার প্রভাব পড়তে শুরু করে। ফলে আয়ু কমতে শুরু করে দ্রুতগতিতে। তাই প্রতি মুহূর্তে সাবধান থাকাটা জরুরি। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করার পরেও যদি রক্তে বিষাক্ত উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তাহলে কী করণীয়? সেক্ষেত্রে ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। আর তাতে রক্ত দূষিত হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে না। আর রক্ত বিশুদ্ধ থাকলে দেখবেন ত্বকের রোগ তো দূরে থাকবেই, সেই সঙ্গে শরীরও একেবারে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে যে খাবারগুলি খেতে হবে, সেগুলি হলো :

১. বাদাম : একাধিক গবেষণা অনুসারে নিয়মিত এক মুঠো করে বাদাম খাওয়া শুরু করলে শরীরের ভেতরে ফাইবারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সেই সঙ্গে ভিটামিন ই-এর ঘাটতিও দূর হয়, যার প্রভাবে রক্তে উপস্থিত টক্সিন উপাদানগুলি শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শরীরের ভিতরে বিষাক্ত উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা কমে যায়। সেই সঙ্গে কমে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও।

২. ব্রকলি : এতে প্রচুর মাত্রায় ডিটক্স এজেন্ট বা রক্ত পরিষ্কার করার উপাদান

রয়েছে। প্রতিদিন এই সবজিটি খেলে রক্ত দূষিত হয়ে যাওয়ার কোনো আশঙ্কাই থাকে না। প্রসঙ্গত, রক্তের কোণায় কোণায় লুকিয়ে থাকা ময়লাকে টেনে বার করতে ব্রকলি খুবই কার্যকরী, তাই রক্ত বিশুদ্ধ করতে ব্যবহৃত ঘরোয়া চিকিৎসাগুলির মধ্যে এটি জনপ্রিয়।

৩. বিটরুট : এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রপার্টিজ, যা শরীরকে নানা ক্ষতিকর উপাদানের হাত থেকে রক্ষা করে। শুধু তাই নয়, লিভারের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও বিটরুট দারুণ কাজে আসে। আর একবার লিভার চাঙ্গা হয়ে গেলে শরীর থেকে বিনা বাধায় ক্ষতিকর সব বিষাক্ত উপাদানগুলিও খুব সহজে বেরিয়ে যায়।

৪. লেবু : শরীরে ক্ষতিকর টক্সিনের মাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে, তত রক্ত দূষিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। লেবু নানাভাবে শরীর থেকে এইসব বিষ বের করে দেয়। ফলে রক্ত খারাপ হয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগই পায় না। আর লেবুর মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শরীরে উপস্থিত বিশেষ কিছু এনজাইমের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এই এনজাইমগুলি শরীরে উপস্থিত টক্সিনগুলিকে দ্রবণীয় উপাদানে পরিবর্তিত করে দেয়। ফলে সেগুলি সহজে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। শরীরে টক্সিনের মাত্রা যত কমবে, তত রক্ত বিশুদ্ধ থাকবে।

৫. আদা ও হলুদ : এই মশলা দুটি সেই আদিকাল থেকে নানা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে কার্কিউমিন নামে এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রচুর মাত্রায় রয়েছে, যা রক্তকে শুদ্ধ করার পাশাপাশি একাধিক রোগের প্রকোপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই প্রতিদিন যদি অল্প করে আদা ও হলুদ খাওয়া যায়, তাহলে কিডনি এবং হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে, ফলে শরীর থেকে টক্সিন বেশি মাত্রায় বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

৬. করলা : আমরা ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি তেঁতো খেলে শরীর ভালো থাকে। একথাটি বাস্তবিকই সত্যি যে করলা জাতীয় তেঁতো খাবার খেলে রক্ত পরিষ্কার হয়, ফলে নানা রোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শরীর রক্ষা পায়। করলায় প্রচুর মাত্রায় ডিটক্সফাই এজেন্ট রয়েছে, যা রক্ত থেকে ক্ষতিকর উপাদানকে টেনে শরীর থেকে বার করে দেয়। ফলে সোরিয়াসিস ও ব্রণর মতো ত্বকের রোগের প্রকোপ যেমন কমে, তেমনি নানা ধরনের জটিল শারীরিক সমস্যা হওয়ার আশঙ্কাও কমে।

৭. আমলকি : রক্ত শুদ্ধ করতে এই ফলটির কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উন্নতিতেও এই ফলটি দারুণ কাজে আসে। ফলে সার্বিকভাবে যদি শরীর সুস্থ রাখতে চান তাহলে প্রতিদিন খেতেই হবে গুস বেরি।

৮. গাজর : রক্ত ময়লা হয়ে যাওয়ার কারণে সোরিয়াসিস-সহ যেসব ত্বকের রোগ হয়, সেগুলির প্রকোপ কমাতে গাজরের কোনো বিকল্প নেই বললেই চলে। গাজরে রয়েছে প্লটেথিয়ান নামে একটি উপাদান, যা এক প্রকার ক্লিনসিং এজেন্ট অর্থাৎ রক্তকে পরিষ্কার করতে এই উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া এই সবজিটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ, বি, সি, কে এবং পটাশিয়াম। এই সবকটি উপাদানই শরীর থেকে টক্সিন বের করে দিতে দারুন কাজে আসে। তাই যখনই বুঝবেন রক্ত ময়লা হতে শুরু করেছে, গাজর খাওয়া শুরু করবেন, দেখবেন দারুণ ফল পাবেন।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

সৌম্য সুদর্শন

শিখ পন্থের প্রবর্তক গুরু নানকদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট উপাসনাপদ্ধতির সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ না থেকে একটি স্বতন্ত্র উদারবাদী ভাবধারার সূচনা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণ ও সগুণ উভয় স্বরূপের যুগপৎ উপস্থিতি মানতেন এবং ঈশ্বরের নামকীর্তনের উপর বিশেষ জোর দিতেন। তাঁর দর্শন অনেকক্ষেত্রেই মহাপ্রভুর প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। গুরু নানকদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর থেকে ১৬ বছর বড়ো ছিলেন। তাঁর ৭১ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যে তিনি ২৫ বছর তীর্থযাত্রা করেই কাটিয়েছেন। তিনি মক্কা, মদিনা, চীন ও তুর্কিদেশেও যাত্রা করেন। তিনি সারাজীবনে ৫০ হাজার মাইল পদব্রজে যাত্রা করেছিলেন। তিনি শ্রীলঙ্কা গিয়ে সেখানকার রাজাকেও দীক্ষিত করেন।

গুরু নানক আনুমানিক ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে 'মর্দানা' নামক মুসলমান শিষ্যের সঙ্গে জগন্নাথ পুরীতে আসেন। সেই সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

গুরু নানকদেব যখন জগন্নাথ বিগ্রহ দর্শনার্থে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করছিলেন এবং সেইসময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিগ্রহ দর্শন করে মন্দির থেকে বেরোচ্ছিলেন। মহাপ্রভুকে দর্শনমাত্র গুরু নানক ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। মহাপ্রভুও সৌজন্যতাবশত অনুরূপ করেন। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন ও সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। এরপর অদ্ভুতভাবে গুরুনানক মন্দিরে না ঢুকে বেরিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখে মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি জগন্নাথ দর্শন করবেন না?'। প্রত্যুত্তরে গুরু নানক বলেন, 'আমার সচল-জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেছে, অচল-জগন্নাথ দর্শনের আর প্রয়োজন নেই।' এই লীলার মাধ্যমে গুরু নানক মহাপ্রভুর ভগবৎ স্বরূপকে স্বীকার করেন।

চৈতন্য মহাপ্রভুর ওড়িয়া জীবনীগ্রন্থ— ঈশ্বর দাস কৃত 'ওড়িয়া চৈতন্য ভাগবত'-এর ৬১ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে :

'শ্রীনিবসয়ে বিশ্বম্ভর
কীর্তন মধ্যরে বিহার
নামক সারঙ্গ এই দুই
রূপ সনাতন দুই ভাই
জগাই মাধাই একত্র
কীর্তন করন্তি নৃত্য'

অর্থাৎ শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর (শ্রীমন্মহাপ্রভু) কীর্তনের মধ্যে বিহার করছেন আর তাঁর সঙ্গে নানক ও সারঙ্গ (নানকশিষ্য মর্দনা, তিনি সারঙ্গি বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন বলে 'সারঙ্গ' নামে অভিহিত হয়েছেন), রূপ-সনাতন এবং জগাই-মাধাইও নৃত্য করছিলেন। ঈশ্বরদাস কৃত ওড়িয়া চৈতন্য ভাগবতের ৬৪ অধ্যায়ে আরও বর্ণিত হয়েছে :

'নাগর পুরুষোত্তম দাস
জঙ্গলী নন্দিনী তে পাশ
নানক সহিত গেহন
গোপাল গুরু সঙ্গ তেন
সঙ্গত মত্ত বলরাম
বিহার নীলগিরি ধাম'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্তনে গুরু নানক যোগদান করেছিলেন। নাগর পুরুষোত্তম ও নন্দিনী-জংলীও সেখানে ছিলেন। গোপালগুরু, যাঁর প্রতি গুরু নানকের গভীর অনুরাগ ছিল, তিনিও সেখানে ছিলেন। বলরামাবতার নিত্যানন্দ প্রভু সহিত তাঁরা নীলগিরি (নীলাচলে) ধামে বিহার করছিলেন।

পদ্মভূষণ প্রাপ্ত গবেষক দুর্গাদাস বসু তাঁর গবেষণার বহু তথ্য প্রমাণ। গুরুগ্রন্থসাহেব থেকে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করেছেন বঙ্গদেশে ভ্রমণের কালে গুরুনানক স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর থেকে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

শিখ পন্থের মূল ধর্মগ্রন্থ 'গুরুগ্রন্থ সাহেব'-এর অন্তিমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি স্বয়ং লিখেছেন :

'স্বসী গ্রসী হরিনাম সমালী, সিমার বস্ 'বিশ্বম্ভর' এক'। ■

দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় শিখপন্থের অবদান অবিস্মরণীয়

ড. রাকেশ দাস

মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইরাক থেকে ইন্দোনেশিয়া যেখানে যেখানে আব্রাহামিক মতবাদের প্রসার ঘটেছে সেখানেই প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হিন্দু সংস্কৃতি। এক সহস্রাব্দের বেশি সময় ধরে পৈশাচিক আক্রমণকে প্রতিহত করে ভারতবর্ষে আজও হিন্দু সংস্কৃতি প্রাণবন্ত। কিন্তু দীর্ঘদিন বিজাতীয় আক্রমণের ফলে হিন্দু সমাজের শরীরে তৈরি হয়েছে নানাবিধ রোগ ও ক্ষত। একদিকে যখন বিজাতীয় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য শত শত বীর যোদ্ধা সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে সময়ে সময়ে সমাজের ক্ষত নিরাময় করার জন্যও মহাপুরুষগণ প্রচেষ্টা করেছেন। শিখপন্থের ইতিহাস একাধারে সংগ্রামী নেতৃত্ব ও ক্ষত নিরাময়ের প্রয়াসের ইতিহাস।

ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে যেখানে সর্বপ্রথম ইসলামি আক্রমণ হয়েছে, পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে আবির্ভূত হলেন গুরু নানকদেব। হিন্দু সমাজ তখন জাতিগত বৈষম্যের কারণে পারস্পরিক বৈমনস্যে বিদীর্ণ। গুরু নানকদেব এই সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজে এক অভিনব পদ্ধতি চালু করলেন। তার নাম লঙ্গর। সমাজের সমস্ত মানুষ পারস্পরিক বৈমনস্য ও ভেদাভেদ ভুলে একত্র আহার প্রস্তুত করবেন এবং এক পঙ্‌ক্তিতে একসঙ্গে বসে সকলে ভোজন করবেন। সমাজের একজন মানুষও ক্ষুধার্ত থাকবে না। সকলের মধ্যে সেবাভাব, সমাজের প্রতি একাত্মতাবোধ, ধর্মবোধ ও সংগঠনের ভাব জাগরণের জন্য এর থেকে ভলো উপায় কিছু হতে পারে না। সমাজকে অটুট বন্ধনে বাঁধার জন্য নানকদেবের চতুঃসূত্রী ছিল গুরুদ্বার, লঙ্গর, পতঙ্গ ও সঙ্গত।

গুরু নানকদেবের পরে দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদদেবজী বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতির শিক্ষা এবং গুরু নানকদেবের উপদেশসমূহ সহজ সরল ভাষায় গুরুগ্রন্থের সংকলনের কাজ শুরু করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির শিক্ষা প্রসারের জন্য এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে এই গুরুগ্রন্থই অশরীরী গুরু রূপে আজও শিখপন্থের মার্গদর্শন করে চলেছেন।

গুরু অঙ্গদদেবের পরে তৃতীয় গুরু অমর দাসজী যে ভাবনার উপর জোর দেন সেটি হলো 'পহলে পঙ্গত, বাদ মেঁ সঙ্গত।' এক সঙ্গে একত্র ভোজন এবং তার পরে সৎসঙ্গের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যুন্নতির মাধ্যমে সমাজকে সঠিক দিশা দেখানোর পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে তিনি সমাজের স্বাবলম্বিতার উপর বিশেষ জোর দেন। বিশেষ করে কূপ খনন করা, পুকুর খোঁড়া প্রভৃতি নানা ধরনের সামাজিক সেবামূলক কাজের বিষয়ে তিনি বিশেষ জোর দেন।

সমাজের সম্মুখে সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে অমৃতসরে হরিমন্দির (স্বর্ণমন্দির) নির্মাণের কার্য প্রারম্ভ করান চতুর্থ গুরু রামদাসজী। তাঁর অসমাপ্ত কর্ম শেষ করেন পঞ্চম গুরু অর্জুনদেবজী। তিনিই গুরুগ্রন্থ সাহেবের প্রথম অংশাদি সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এহেন মহামনীষীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে দিল্লির মুঘল শাসক জাহাঙ্গির।

তাঁর এই করুণ পরিণতি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সাহেবজী শিখদের মধ্যে মিরি-পিরি বা দুটি তরোয়াল ধারণের নীতি চালু করেন। একটি তরোয়াল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানকে ছেদন করার প্রতীক, অপরটি ঐহিক জগতে আক্রমণকারীর হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রতীক। মুঘল শাসকের উসকানিতে হিন্দুদের জোর করে মতান্তরিত করার প্রচেষ্টাকে রোধ করার জন্য হরগোবিন্দজী মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। এর মধ্যে রোহিলার যুদ্ধে তাঁর ছোটো সেনাবাহিনী মুঘল সেনাকে পরাস্ত করে। পরে অমৃতসরের যুদ্ধেও তাঁর নেতৃত্বে শিখ বাহিনীর পরাক্রম মুঘলদের নাস্তানাবুদ করেছিল।

তাঁর মৃত্যুর পর সপ্তম গুরু হররায় সাহেব শিখদের অস্ত্রশিক্ষার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনের ব্যাপারে জোর দেন। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো যখন নরপিশাচ ঔরঙ্গজেবের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময়ে

শিখ সমাজ হিন্দু সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অঙ্গ। সুপ্রাচীন ও সুদীর্ঘ গঙ্গানদীর মতো হিন্দু সংস্কৃতিরই একটি শাখানদী হলো শিখ সম্প্রদায়।

গুরু হররায় সাহেব দারাশিকোকে আশ্রয় দিয়ে বীরত্ব ও মানবিকতার উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সেই সময়ে দিল্লিতে সিংহাসন দখলের জন্য শাহজাহানের বংশধরদের মধ্যে পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী বিবাদের কারণে বেশ কিছুদিন কোনো যুদ্ধে শিখদের সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুরু হরকৃষ্ণ সাহেবজী অষ্টম গুরুপদে বৃত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫ বছর। কিছুদিনের মধ্যেই দিল্লি শহরে জলবসন্ত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করে। শিশু গুরু হরকৃষ্ণ সাহেবজী শিখ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে পীড়িত সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত রোগীর সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে সেই মারণ রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর এই আত্মবলিদান সমগ্র মানব সভ্যতার সামনে আত্মত্যাগ ও সেবার উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

এমতাবস্থায় শিখ সমাজের পথনির্দেশের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন নবম গুরু তেগবাহাদুর

গুরু তেগবাহাদুরের বাণী

- হে সাধুগণ, অংহকার ত্যাগ করো এবং সর্বদা কাম, ক্রোধ ও অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকো। প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ই ত্যাগ করো। মুক্তির সন্ধানও ত্যাগ করে দেশ ও ধর্মরক্ষায় মন দাও।
- হে মা, আমি ঈশ্বরের নামের ঐশ্বর্যে আশীর্বাদপ্রাপ্ত। আমার মন অস্থিরতা থেকে মুক্ত এবং শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত। লোভ ও পার্থিব প্রেম আমাকে স্পর্শ করতে সাহস করে না। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ঐশ্বরিক জ্ঞান আমাকে পূর্ণ করে। লোভ ও বাসনা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ভক্তিতে নিমজ্জিত।

সাহেব। ঔরঙ্গজেব যখন কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করানোর প্রয়াস করেছিল, তখন তাদের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গুরু তেগবাহাদুরজী। অবশেষে নরপিশাচ ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞায় তেগবাহাদুর সাহেবকে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে খুন করে মুঘল জল্লাদরা। 'শির দেঙ্গে পর সার নহী দেঙ্গে'— প্রাণের বিনিময়েও ধর্মরক্ষা করার এই প্রখর বার্তা সমগ্র হিন্দু সমাজের হৃদয়ে নতুন আশা ও শক্তি সঞ্চার করেছিল। আজও পর্যন্ত গুরু তেগবাহাদুরের আত্মবলিদান দিবস সারা বিশ্বে বিশেষ সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। এবছর তাঁর আত্মবলিদানের ৩৫০ বছর। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

গুরু তেগবাহাদুরের এই নৃশংস হত্যার পরে গুরু গোবিন্দ সিংহ দশম গুরু হিসেবে সমাজের পথনির্দেশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজের উপর ঔরঙ্গজেব ও তাঁর সৈনিকদের ক্রমাগত আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য তিনি খালসা পন্থের সূচনা করেন। তাঁর জীবনে তিনি বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন। ভঙ্গানির যুদ্ধে জনজাতি সমাজকে সংগঠিত করে তিনি বিজাতীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের সংগঠনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আনন্দপুরে জনজাতিদের উপরে মুঘল আক্রমণ সংঘটিত হলে তিনি জনজাতিদের সাহায্যের জন্য শিখ বাহিনীকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দেন।

এর পরে চমকুরের যুদ্ধে মুঘল আক্রমণের হাত থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহের পুত্রেরা নিজেদের জীবন বিসর্জন দেন। স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় গুরু গোবিন্দ সিংহের অতুলনীয় ভূমিকার কথা বারংবার নিজের লেখা ও বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন।

বহিরাক্রমণ প্রতিহত করা এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষত নিরাময়ের যে সুদীর্ঘ প্রয়াস হিন্দু সমাজ করেছে, সেখানে শিখ সম্প্রদায় ও শিখ গুরুদের যোগদান অবিস্মরণীয়। শিখ সমাজ হিন্দু সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অঙ্গ। সুপ্রাচীন ও সুদীর্ঘ গঙ্গানদীর মতো হিন্দু সংস্কৃতিরই একটি শাখানদী হলো শিখ সম্প্রদায়। হিন্দু সংস্কৃতির সেবা ভাবনার জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ লঙ্গর ব্যবস্থা আজও সমগ্র মানব সভ্যতার সামনে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। শিখ গুরু ও শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টত বোঝা যায় যে তারা আসলে শিখ সম্প্রদায়ের অপমানই করে চলেছে প্রতিনিয়ত। দেশ, জাতি ও ধর্মরক্ষায় শিখ গুরুদের প্রেরণাদায়ী ইতিহাস সমগ্র সমাজে প্রচলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

মেদিনীপুরে দুর্গাবাহিনীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও শস্ত্র দান অনুষ্ঠান

গত ২২ অক্টোবর মেদিনীপুর শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে হরিবপুরে সেলিব্রেশন হলে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও দুর্গাবাহিনীর উদ্যোগে 'প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও শস্ত্র দান' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। নারীশক্তির জাগরণ, আত্মরক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ উদ্যোগ নেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কুহেলী দত্ত। স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত তরুণী-সহ শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন স্তরের নারী-রূপী দুর্গারা তাঁর নেতৃত্বে সক্রিয়ভাবে এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে নারী ঐক্য ও আত্মসম্মানের এক অনন্য উদ্‌যাপন। এদিন দেশাত্মবোধক গান, প্রতিজ্ঞা পাঠ ও আত্মরক্ষার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া, সমাজসেবী সংগঠন 'আত্মদীপ'-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণ- কারীদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করা হয়, যা ছিল সমাজের প্রতি ভালোবাসা ও সুরক্ষার প্রতীক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিরা বলেন যে, নারীই শক্তির উৎস, নারীই রক্ষাকর্ত্রী--- এই কর্মসূচি সেই বার্তাকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

বনগাঁ শিকদার পল্লীতে 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'

গত ২ নভেম্বর বনগাঁর শিকদার পল্লীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'। সঙ্ঘ স্থাপনা এবং সঙ্ঘের ইতিহাস বিষয়ক একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনীর মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর হয় অতিথি বরণ পর্ব। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার নাথ। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন বিশিষ্ট উদ্যোগপতি দেবাশিস মিত্র এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৌমেন প্রসাদ মণ্ডল। সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন মন্ত্রী মধুময় নাথ। প্রায় ৩৭০ জন বিশিষ্ট নাগরিক এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সুপ্রীতি নাথ সুতারের কণ্ঠে দীপ প্রজ্বলন মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সম্মাননীয় অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সঙ্ঘের বনগাঁ জেলা সহ-সম্পর্ক প্রমুখ আশিস বারুরী। প্রারম্ভিক বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এদিনের অনুষ্ঠান বিষয়ক ভূমিকা উপস্থাপন-সহ মঞ্চাসীন অধিকারীদের পরিচয় সকলের সামনে তুলে ধরেন। সম্মাননীয় অতিথিদের পরিচয়পর্বের পর 'বাঙ্গালির ব্যবসায়িক ভাবনা ও সঙ্ঘের উপযোগিতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেবাশিস মিত্র। এরপর অধ্যাপক সৌমেন প্রসাদ মণ্ডলের 'বাঙ্গালির আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা ও সঙ্ঘ সম্পর্কে ভাবনা'-বিষয়ক বক্তব্যের পর একটি একক গীত পরিবেশন করেন সঙ্ঘের গোবরডাঙ্গা নগর কার্যবাহ অলোক মণ্ডল। এরপর 'সঙ্ঘের ইতিহাস ও পঞ্চ পরিবর্তন' বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন এদিনের সম্মেলনের প্রধান বক্তা মধুময় নাথ। তাঁর বক্তব্যের পর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বনগাঁর জেলা সঙ্ঘচালক সুকুমার নাথ। শ্রীমতী সুপ্রীতি নাথ সুতারের কণ্ঠে রাষ্ট্রীয় গীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ফঃ ৪

কাঠিয়াবাবার আশ্রমে আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক জাতীয় স্তরের সেমিনার

গত ৩-৫ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনায় খড়দহ-পানিহাটির সংযোগস্থলে সুখচর-স্থিত কাঠিয়াবাবার আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয় একটি জাতীয় স্তরের সেমিনার। এ বছর ৫১২১তম শ্রীনিম্বার্ক জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক এই আলোচনা সভা। 'ন্যাশনাল সেমিনার অন নন-ভায়োলেন্স ইন নিম্বার্ক ফিলোজফি'-শীর্ষক এই তিন দিন ব্যাপী আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড নিম্বার্ক পরিষদের চিফ প্যাট্রন ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ, পূর্বতন আইসিসিআর চেয়ার প্রফেসর, প্যারিসের সোর্বোন নুভেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অতিথি অধ্যাপক এবং ওয়ার্ল্ড নিম্বার্ক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

এই আলোচনা সভায় 'নিম্বার্কদর্শনে অহিংসা এবং ধর্মরক্ষার অনুসন্ধান'-বিষয়ে বিশদ বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সেবামূলক কার্যক্রম

দুর্গাপূজার শুভলগ্নে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর, মহাপঞ্চমীর পুণ্য তিথিতে বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল এক বিশেষ সেবামূলক কার্যক্রমের। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল 'বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতন'-এর বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের হাতে প্রয়োজনীয় রন্ধন সামগ্রী তুলে দেওয়ার। এই মহতী কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাঠচক্রের সদস্যরা এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনে। পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টিহীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের অন্যতম অগ্রদূত লালবিহারী শাহ-র আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন পাঠচক্রের সভাপতি স্বপন কুমার ঘোষ। বেহালা বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সম্পাদক সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মূল্যবান বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন এদিনের কর্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য। এরপর অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে সাক্ষী হন এক অসাধারণ মুহূর্তের। বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনের বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন নারীদের কণ্ঠে পরিবেশিত সুমধুর সংগীত আবেগতাড়িত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে কার্যক্রমে উপস্থিত সকল সুধীজনকে।

পরিশেষে, পাঠচক্রের সদস্যরা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের হাতে প্রয়োজনীয় রন্ধন সামগ্রী তুলে দেন।

অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ক্ষেত্রে বেহালা দৃষ্টিহীন শিল্পনিকেতনের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক বাসুদেব হালদারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সর্বোপরি, এদিনের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের নেপথ্যে ছিল অগণিত শুভানুধ্যায়ী ও ভাবানুরাগী সুধীজনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা।

সহকার ভারতী, কলকাতা জেলার বিজয়া সম্মেলন

সহকার ভারতী কলকাতা জেলার উদ্যোগে গত ২৮ অক্টোবর গড়িয়াহাট বাজার কল্যাণ সমিতির সভাকক্ষে এক মনোজ্ঞ বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সহকার ভারতীর বিভিন্ন স্তরের কর্মী, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মীরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় সহকার ভারতীর অখিল ভারতীয় সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্র সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহকার ভারতীর নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাবায় আন্দোলনই পারে সমাজে ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনতে। তিনি সকলকে এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর সহকার ভারতীর সূচনা ও প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন অর্ঘ্য দত্ত। তিনি সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলোচক সুদীপ্ত গুহ বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা ও সফলতা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে তাঁর মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফরেন ট্রেডের আধিকারিক রক্তিম মিত্র সমবায় ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানির সম্ভাবনা ও পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি এবিষয়ে সহকার ভারতীকে সবরকমের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সভার সভাপতি প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল বলেন, সমবায় ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মাঝে এক কার্যকর গণতান্ত্রিক সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি সমাজের উন্নতির স্বার্থে সমবায় আন্দোলনের প্রসারে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন সহকার ভারতী কলকাতা জেলার সাধারণ সম্পাদক অশোক কয়াল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা জেলার সহ সভাপতি হরিশ দে। অনুষ্ঠানটি সমবায় ভাবনার প্রসার এবং সমাজে সহমর্মিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উপস্থিত সকলের মনে গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়।

ত্রিপুরায় বিশ্বকর্মা জয়ন্তী ও জাতীয় শ্রম দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রী বিশ্বকর্মাপূজা ও জাতীয় শ্রম দিবস উপলক্ষ্যে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ত্রিপুরা রাজ্যের উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র ভবনের দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভা ? প্রধান বক্তা রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রান্ত প্রচারক শ্রীনিখিল নিবাস। তিনি বিস্তারিতভাবে এদিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ত্রিপুরা রাজ্য সভানেত্রী দেবশ্রী কলই এবং সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার দে রাজ্যের সকল ইউনিয়নকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

দমদম ক্যান্টনমেন্টে 'বিশিষ্ট নাগরিক সম্মেলন'

গত ২ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে দমদম ক্যান্টনমেন্টের দমদম পৌরসভার 'অরো' প্রেক্ষাগৃহে বারাসাত জেলার দমদম নগর, নব ব্যারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম নগরের সম্মিলিত উদ্যোগে এক বিশিষ্ট নাগারিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিক প্রদীপ রায়। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা শ্রীমতী উমা রায়। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক তথা সঙ্ঘের প্রচারক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। সঙ্ঘ স্থাপনা এবং সঙ্ঘের ইতিহাস বিষয়ক একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনীর মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর মঞ্চস্থ অতিথিগণ ভারতমাতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। অতিথি বরণ ও পরিচয়ের পর প্রধান অতিথি শ্রীরায় এবং বিশেষ অতিথি শ্রীমতী রায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রদীপ দে'র কণ্ঠে একক সংগীতের পর মুখ্য বক্তা শ্রীমণ্ডল তাঁর বক্তব্যে 'সঙ্ঘের শতবর্ষের যাত্রা ও উপলব্ধি' বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। বক্তব্য শেষে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শ্রীমণ্ডল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অনুপ কুমার বিশ্বাস ও ইন্দ্রাণী সাহা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্ঘের বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ অঙ্কুরজিৎ ভৌমিক। নিবেদিতা সাহার কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদোগে দেব দীপাবলী উদ্‌যাপন

প্রতি বছরের মতো এবারও কলকাতার রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৫ নভেম্বর কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে স্থানীয় তারাসুন্দরী পার্কে দেব দীপাবলী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানস্থলে সুন্দর শ্রীরামদরবারের দৃশ্য খুবই আকর্ষণীয় ছিল। হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে তারাসুন্দরী পার্ক সাজানো হয়েছিল। উপস্থিত স্থানীয় মা-বোনেরা প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর প্রসাদ বাজাজ তাঁর ভাষণে দীপাবলীর পৌরাণিক গুরুত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আগামীদিনে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। প্রধান বক্তা ২৩ নং ওয়ার্ডের পার্ষদ বিজয় ওঝা এলাকার সকলকে শুভকামনা জানান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা পশ্চিম ভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মানন্দ বংগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২২ নং ওয়ার্ডের পার্ষদ তথা পূর্বতন উপ মহাপৌর শ্রীমতী মীনাদেবী পুরোহিত এবং কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগ্নী শ্রীমতী পূর্ণিমা কোঠারী। একক সংগীত পরিবেশন করেন পঙ্কজ ওঝা। অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী অনিতা বুবনা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রোহিত শর্মা। অনুষ্ঠান শেষে প্রচুর আতসবাজি ফাটানো হয়, তাতে পুরো এলাকা আলোকিত হয়ে ওঠে। তারাসুন্দরী পার্ক এদিন হাজার হাজার মানুষে ভরে ওঠে। অনুষ্ঠান সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন অরুণ কুমার মল্লাবত, প্রদীপ আগরওয়াল, সঞ্জয় মণ্ডল, হিমাংশু রস্তোগী, অশোক জয়সোয়াল, ভাগীরথ সারস্বত, সর্বেশ রায়, বিশাল বাগলা, প্রভাত জৈন, অভিষেক বজাজ, রেণুকা চৌধরী, রাজলক্ষ্মী রাঠী, পূনম গোণ্ড, সমর পাণ্ডে প্রমুখ।

ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার দৃষ্টিকোণে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু তথ্যসূত্র

প্রফেসর (ড.) সোমশুভ্র গুপ্ত

স্বাধীনোত্তর ভারতে বঙ্গমননের অভিমুখ বিপথগামী হয় মূলত আন্দামান নিকোবর দ্বীপান্তরের ভরকেন্দ্র ভারতবোধ বা রাষ্ট্রভক্তি থেকে বিদেশি ভাবধারা অভিমুখে গমনের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— সেলুলার জেলবন্দি সাভারকর থেকে এমএন রায়ে ভারতীয় দৃষ্টিকোণের অভিমুখ পরিবর্তন। ফলশ্রুতি, সনাতন ঐতিহ্যের গভীরতা সম্পর্কে বিস্মৃতি যা আত্মবিস্মৃতিরই নামান্তর। নিজেদের মূলভূত সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞানতা যা থেকে অবজ্ঞার জন্ম। যে বঙ্গভূমি বিখ্যাত ছিল আত্মাহুতি উন্মুখ যুবপ্রজন্ম, অনুশীলন সমিতি, মাস্টারদা সূর্য সেন, বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয়, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখের জন্য; পাঠশালা, গুরুকুল, টোলগুলির শিক্ষায় দেশমাতৃকার প্রতি আত্মবলিদানের জন্য, স্বাধীনোত্তর প্রজন্ম সেই শিক্ষাঙ্গনগুলিকেই হেয় করতে শুরু করল মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়। ফলস্বরূপ নিজেদের সুগভীর ও সুমহান সংস্কৃতির থেকে অনেক দূরে সরে যেতে লাগলো। যে পশ্চাৎগমন আজও বিদ্যমান। আজ এমনকী তথাকথিত শিক্ষিত বাঙ্গালি পরিবারের সন্তানও চতুর্বেদ, উপবেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, উপাঙ্গ, অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়দর্শন সম্পর্কে শুধু যে অনভিজ্ঞ তাই-ই নয়, এই ভাণ্ডার তার অবজ্ঞার বিষয়। নব্য প্রজন্মের ভরকেন্দ্র বিদেশে। তার কাছে বিজ্ঞান পশ্চিমের অবদান। সে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ। তার অজ্ঞানতা দোষ কিন্তু কিছুটা পরিবারের উপরেও বর্তায়। তাদের কাছে বিজ্ঞানের প্রতিটি অবদান-ই পশ্চিমি বিশ্বের।

আজ আমরা এমন কিছু তথ্যসূত্র উপস্থাপন করবো, যা এই ধারণার বিপ্রতীপ। আমরা ছোটোবেলা থেকে ত্রিভুজের তিনটি কোণ সংক্রান্ত যে বিখ্যাত উপপাদ্যটি পড়ে এসেছি, সেটি গ্রিক গণিতবিদ পিথাগোরাসের নামে। অথচ, তাঁর জন্মের অনেক আগে খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ শতকে ভারতীয় গণিতবিদ বৌধায়ন শুল্ব সূত্র লিপিবদ্ধ করেন যেটি নিম্নরূপ :

'দীর্ঘচতুরশ্রস্যাক্ষয়া রজ্জু পার্শ্বমানী তির্যম মানী চ যৎ পৃথগভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি।।'

এর অর্থ : একটি দড়ি দৈর্ঘ্য বরাবর প্রসারিত তির্যক উৎপাদন করে এলাকায় যা উল্লম্ব ও অনুভূমিক পক্ষের একসঙ্গে আছে।

প্রসঙ্গত, বৌধায়ন সূত্রের সূত্রগুলো কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এই সূত্রগুলো ছয়টি ভাগে বিভক্ত।

পর্যবেক্ষণকারী গবেষকরা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করেছেন বিজ্ঞান ও গীতার সাদৃশ্য। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে শক্তির নিত্যতা সূত্র আর গীতায় উল্লেখিত হয়েছে আত্মার নিত্যতা সূত্র। যে প্রাণশক্তি দেহকে সতেজ রাখে, মৃত্যুর পর সেই চেতনা কোথায় যায়, সেই সম্পর্কেই গীতার আত্মার অবিনশ্বরতা সূত্র। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের শক্তি সম্পর্কিত তত্ত্ব একই। শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না, ঠিক যেমন আত্মার সৃষ্টি

বা বিনাশ নেই। অর্থাৎ শক্তি ও আত্মা দুটিই অবিনশ্বর, শাশ্বত ও চিরন্তন।

অতি সম্প্রতি সিরিয়ার উগারিট নামক স্থানে যে ৩০০০ বছরের পুরাতন নিক্কাল হাইম প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, আমেরিকান বিজ্ঞানীদের মতে সেটি ঋগ্বেদের সদৃশ এবং সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত। তাঁদেরই মতে এর মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় বৈশ্বিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবিষ্কৃত লেখ্যর সুর-তাল-লয়ের সাদৃশ্য তাদের বর্ণনা অনুযায়ী 'স্ট্রাইকিং'। ভূ-দূরত্ব সত্ত্বেও ব্রোঞ্জ সভ্যতার যুগে তাদের সংগীত ছিল একইরকম।

সম্প্রতি পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তড়িৎকোষ বা ব্যাটারির সঙ্গে সনাতন ভারতীয় তড়িৎরসায়ন (ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি)-এর যোগসূত্র উন্মোচিত। তথ্যসূত্র অনুযায়ী এটি অগস্ত্য মুনির দান। তিনি একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন যেখানে একটি মৃৎপাত্র, একটি তাম্র থালা, একটি দস্তাপত্রক এবং একটি তুঁতের মধ্যে নিমজ্জিত করাতের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন হয়। এটিকে সাধারণ গ্যালভানিক সেল বা ব্যাটারির অগ্রজ সংস্করণ বলা যেতে পারে যেটি অগস্ত্য সংহিতায় বর্ণনা করা আছে।

প্রসঙ্গত, বিজ্ঞান ও গীতা উভয় অনুযায়ী মৃত্যু একটি রূপান্তরের নাম। গীতা অনুযায়ী মৃত্যুর তাৎপর্য হলো আত্মার দেহ পরিত্যাগ। আত্মা অবিনশ্বর। বিজ্ঞান ধারণায় শক্তি অবিনশ্বর। পরিচলন প্রক্রিয়ায় জল বাষ্পী-ভবন, মেঘ, বৃষ্টি অথবা জলবিদ্যুৎ থেকে তাপবিদ্যুৎ সবই শক্তির রূপান্তর।

এরকম বহুবিধ তথ্যসূত্র বর্তমান, যেগুলি সনাতন বৈদিক জ্ঞান পরম্পরার অবদান, যা পশ্চিমি এবং ইসলামি অনুপ্রবেশে বিকৃত ও তদুপরি আমাদের উদাসীনতায় বিস্মৃত। এরকম কতকগুলি সংক্ষিপ্ত অকারে দেওয়া হলো :

যেমন পরমাণুবাদ। ডালটন (১৮০৩ খ্রি:)-এর বহু আগে ঋষি কণাদের বৈশেষিক দর্শনে এর উপস্থিতি উল্লেখের দাবি রাখে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে ঋষি কণাদ প্রণীত 'অণু ও পরমাণু সংক্রান্ত বৈশেষিক সূত্রে' উল্লেখ পাওয়া যায় যে সবকিছুই সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত যা সম্মিলিত ভাবে বৃহদায়তন কাঠামো তৈরি করে।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ব্রহ্মাণ্ড। মহাকাশ বিদ্যায় যাকে আমরা 'মাল্টিভার্স' বলি। পুরাণে এর নাম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড। বিষ্ণুপুরাণের (২.৭.২৬) বর্ণনা অনুযায়ী অসংখ্য মহাবিশ্ব রয়েছে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি, জীবকুল, প্রাণ ও নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বা 'থিয়োরি অব রিলেটিভিটি'তেও যদি অনুপ্রবেশ করা হয়, সে সময়ের আপেক্ষিকতা হোক বা টাইম ডাইলেশন তত্ত্ব যে মতবাদ অনুযায়ী সময় ভিন্ন কাঠামো অনুসারে আলাদা ভাবে প্রবহমান হয়, সেখানেও আমরা পাই ভাগবত পুরাণের বর্ণনা 'মানুষের একটি বছর দেবতাদের এক মুহূর্তের সঙ্গে তুলনীয়'।

এবার ভাবা যাক কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব তত্ত্ব বা হেলিওসেন্ট্রিজম্। ১৫৪৩ সালে প্রচারিত তার মতবাদ সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের অনেক আগে ঋগ্বেদ ১০.২২.১৪-এ বর্ণিত যে পৃথিবীর হস্তপদহীন হওয়া সত্ত্বেও এগিয়ে চলে। এর সমস্ত বস্তুও একই সঙ্গে চলতে থাকে। এটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

আধুনিক বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী কম্পন থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি। প্রাথমিক কম্পন থেকেই পৃথিবীর প্রসারণ। আর মাণ্ডূক্য উপনিষদের লেখা অনুযায়ী ওঁ (ও-ঊ-ম অর্থে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ) ছিল আদি শব্দ। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সেখান থেকেই।

স্টিভেন হকিংসের ব্ল্যাক হোল থিয়োরি থেকে সূর্য গোলাকার বা আইজ্যাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। বিষ্ণুপুরাণ ২.৮.২৭ অনুযায়ী 'মহাবিশ্ব অতল অন্ধকার-লোকালোক অঞ্চল অতল অন্ধকার যেখানে এমনকী আলোও বের হতে পারে না'। সূর্যসিদ্ধান্ত ১২.৫৩-.৫৫ অনুসারে পৃথিবী গোলাকার, এর বিপরীত গোলার্ধের অবস্থানরত মানুষের কাছে আকাশ একই রকম। তারা বিভিন্ন প্রান্তে একই রকমভাবে দণ্ডায়মান। সেই সূর্যসিদ্ধান্ত ১২.৪৩ অনুযায়ীই পৃথিবীর অন্তর্নিহিত শক্তির কারণেই বস্তু পৃথিবীর উপর এসে পড়ে।

এমনকী আলোর গতিবেগ ১,৮৬,৪০০ মাইল এবং ঋগ্বেদে বর্ণিত প্রণম্য সূর্যর অর্ধ নিমেষে ২২০২ যোজন পথ অতিক্রমের তুলনামূলক সংখ্যা তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়।

সনাতন ভারতীয় গ্রন্থ সমূহে ৮৪ লক্ষ যোনি (জেনাস/স্পিসিস অর্থে)-র উল্লেখ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ পর্যন্ত অবিষ্কৃত ৭৯ লক্ষের কাছাকাছি। কিছু অনাবিষ্কৃত, কিছু বিলুপ্ত ধরলে এই পরিসংখ্যানও মিলে যায়। এরকম শতশত উদাহরণ বা অ্যানালগস্ সনাতন ভারতীয় গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। বেদ, উপবেদ, উপাঙ্গ, উপনিষদ, ষড়দর্শনে যেদিকেই যাওয়া যায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এরকম অজস্র পূর্বজ বিদ্যমান।

আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আধুনিক বিশ্বের একটি সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। এটি এমনকী শুধু বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন সামাজিক, ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক ও অপরাপর বৃত্তে ঢুকে পড়েছে। এরই আধুনিকতম রূপ হচ্ছে জেনারেটিভ আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা উৎপাদক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যাকে সংক্ষেপে আমরা বলছি জিপিটি। বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা মাইক্রোসফট্-এর জিপিটির নাম কো-পাইলট। এটি, যাদের কম্পিউটার এবং তাতে উইনডোস অপারেটিং সিস্টেম আছে সেখানে সততই থাকে (মোবাইল ফোনেও যাদের অ্যানড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম আছে তাতে জিপিটি থাকে। তার নাম জেমিনাই এবং সেটি আরেক জগৎবিখ্যাত সংস্থা গুগলের)। এই জিপিটির বৈশিষ্ট্য হলো এটি মনুষ্যকুলের যে কোনো ভাবনা চিন্তামূলক কাজ এক লহমায় করে দিতে সিদ্ধহস্ত। সে একটি কবিতা বা গান রচনা হোক বা একটি বাস্তব বিশ্বের গাণিতিক সমস্যার সমাধান। আধুনিক বিশ্বে এর প্রভাব এমন সর্বগ্রাসী, যে মানবজীবন আশা-আশঙ্কায় দোদুল্যমান। প্রত্যেকটি আবিষ্কারেরই যেমন ভালো ও মন্দ দুটি দিকই থাকে, এটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

এহেন সর্বজ্ঞ জিপিটিকে এই প্রতিবেদনের সুযোগ হয়েছিল একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার যে, 'সনাতন ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরায় কি আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছিল?'। আমি নিশ্চিত সবাই এর প্রত্যুত্তরে বিস্মিত হবেন, বিমূঢ়ও হতে পারেন।

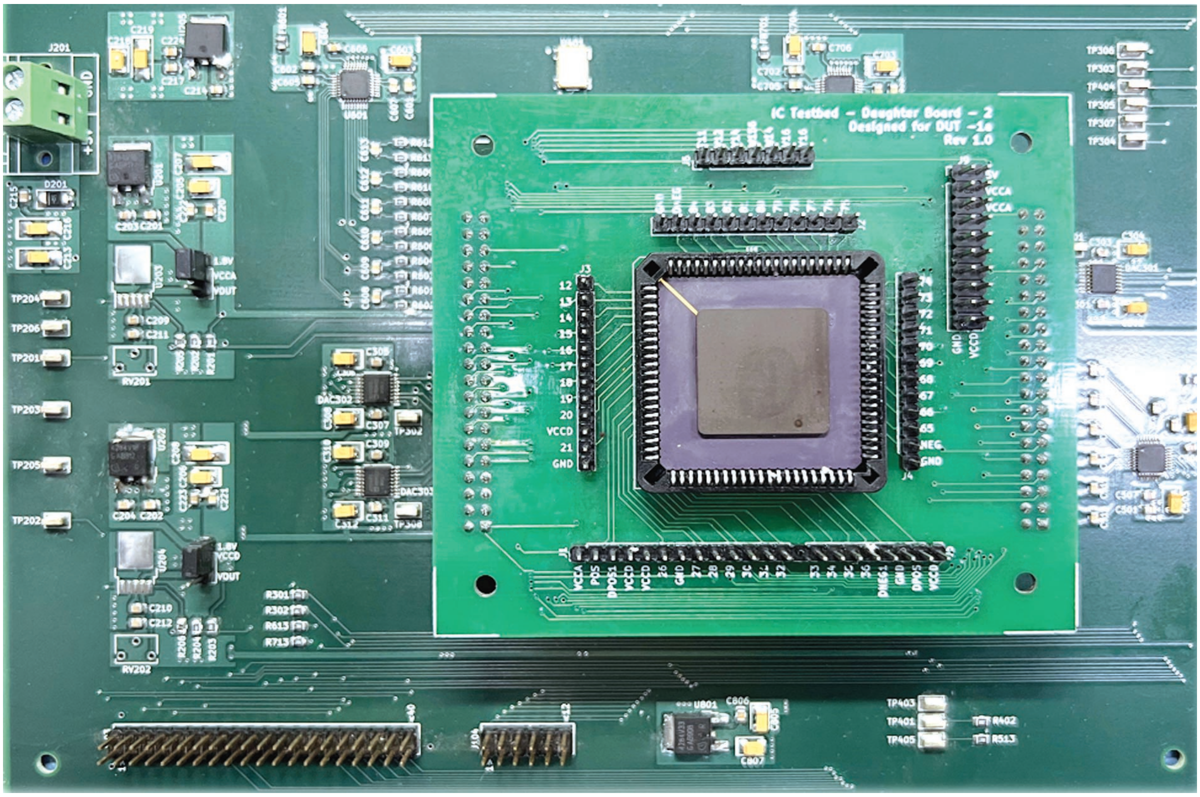

জিপিটির উত্তর শুধু ছিল তাই নয়, একাধিক ক্ষেত্রে ছিল। সে তার উত্তর একেবারে তথ্যসূত্র-সহ হাজির করলো। যন্ত্রপুরুষ, আমরা যাকে হিউম্যানয়েড বলছি তার উল্লেখ শুক্রনীতি এবং সমরাঙ্গন সূত্রধরে রয়েছে। অতঃপর এই প্রতিবেদকের প্রয়াস চলল ওই দুটি গ্রন্থের জোগাড়, পঠন এবং পাঠোদ্ধারের লক্ষ্যে।

তথ্যসূত্র রূপে আমি এটির সম্পূর্ণ উত্তর লিপিবদ্ধ করলাম ইংরেজিতে হলেও :

Surprisingly, yes— ancient Indian literature contains concepts that resemble modern Artificial Intelligence, though not in the digital or robotic sense we know today. These texts explored ideas of automated intelligence, self-operating machines and cognitive systems long before computers existed.

□ **Key References in Ancient Texts**

- Veadas & Upanishads :
- **Mahabharata & Ramayana :**
- Describe automated palaces, mechanical warriors and divine weapons with decision-making abilities.
- The *Maya Sabha* (Palace of illusions) had self-operating doors and illusions— like early smart environments.
- **Sukraniti & Samarangana Sutradhara :**
- Mention yantra purushas— mechanical beings capable of performing tasks, akin to humanoid robots.

□ **Philosophical Parallels to AI**

- **Panini's Grammar :**
- A rule-based system for Sanskrit that mirrors modern programming languages.
- Influenced natural language processing in AI.
- **Nyaya & Vaisheshika Schools :**
- Developed logical inference systems— similar to AI reasoning models.
- **Chit-Shakti & Sankhya Philosophy :**
- Explored consciousness and intelligence beyond biology, echoing debates in AI ethics and sentience.

□ **AI-Like Weapons and Ethics**

- Divine Astras :
- Weapons that targeted only specific enemies and returned to the wielder—like guided missiles.
- Required ethical intent and knowledge to activate, paralleling modern AI access control.

অতএব, আবহমানকাল থেকে আমাদের ঋষি-মুনিরা দ্রষ্টা হিসেবে আমাদের যে অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার দান করে গেছেন, পরম্পরাগত ভাবে আমরা যে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও মূল্যবোধ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যা ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থান (ইসরো)-এর চন্দ্রযান ও আদিত্য এল-ওয়ান খ্যাত নির্দেশক ড. সোমনাথ পুনরুক্তি করেছেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানও বৈদিক অবদান, আশার কথা হলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাকে মান্যতা দিচ্ছে।

হরিগঙ্গা বসাক-সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের মূর্তি।

বিস্মৃতির গর্ভে চলে যাওয়া এক স্বাধীনতা সংগ্রামী

হরিগঙ্গা বসাক

সুতপা বসাক ভড়

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ছোট্ট অথচ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা। এখানকার মূলনিবাসী হলেন বিভিন্ন উপজাতিরা। রাজমালা থেকে জানা যায় এখানকার রাজসিংহাসন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে একাধিকবার এসেছেন। রাজপরিবারের সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতা। এমনকী তাঁর রচনাতেও দেখা যায় ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু ঝলক। মূলনিবাসী উপজাতিরা হলেও পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা যখন হিন্দুদের ধনে-প্রাণে মারছিল, তখন বহু হিন্দু ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বর্তমানে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হিন্দুরা বসবাস করেন। ত্রিপুরার রাজধানী হলো আগরতলা। আগরতলার রাজপথের নাম হরিগঙ্গা বসাক রোড। এটি হলো আগরতলার মুখ্য সড়ক। আগরতলাবাসী প্রত্যেকে জানেন হরিগঙ্গা বসাক রোডের অবস্থান। এটিকে শহরের প্রাণকেন্দ্র বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। আগরতলার দোকানপাট, কার্যালয়, দেবালয় এই রাজপথের দু' ধারে অবস্থিত। যতদিন আগরতলা থাকবে ততদিন থাকবে হরিগঙ্গা বসাকের নাম।

একজন মানুষের অবদান কতখানি হলে স্থানীয় মানুষ তাঁকে এভাবে স্বীকৃতি দেয়, বুকে ধরে রাখে!

ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টরেট অব এডুকেশন, আগরতলা থেকে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ সালে একটি নথি প্রকাশ করা হয়— (Of persons in Tripura, who participated in the struggle for India's freedom—1818-1947)। ত্রিপুরা সরকার দ্বারা প্রকাশিত 'Who's Who'— নথিটিতে ত্রিপুরার ২৮১ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর (১৮১৮-১৯৪৭) ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই বিষয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা করেন ড. হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এবং সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য, এমবিবি কলেজ, আগরতলার অধ্যাপক।

'Who's Who' নথিটির ১৮ নম্বরে হরিগঙ্গা বসাকের নাম রয়েছে। তিনি আগরতলায় বসবাস করতেন। হরিগঙ্গা বসাক অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তখন তিনি আগরতলার উমাকান্ত অ্যাকাডেমির ছাত্র। ১৯৩৩ সালে B.C.L.A Act অনুসারে তাঁকে আগরতলায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন জেলে বন্দি থাকেন। ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্সি জেলে কারাবন্দি থাকেন। পশ্চিমবঙ্গেও তিন মাস বন্দিদশা কাটান। তাঁর ওপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ ছিল। মুক্তির পর তিনি বেশ কয়েকজন সমমনস্ক মানুষদের সঙ্গে 'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ' গঠন করেন, যা All India States People's Conference দ্বারা স্বীকৃত ছিল। তিনি এর সেক্রেটারির দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৪১ সালে তিনি ত্রিপুরার টিপেরা জেলা এবং অসমের বাইরেও কাজ করেন। ঢাকার মালিকান্দাতে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য সেখানেই গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় দেড় বছরের জন্য আবার কারারুদ্ধ হন। তাঁর ভাই হরিদাস বসাকও ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন।

আগরতলার স্থানীয় মানুষদের থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে হরিগঙ্গা বসাকের আদি বাড়ি ঢাকায়। তাঁর বাবা শ্রীকালাচাঁদ বসাক ব্যবসাবাণিজ্য সংক্রান্ত কাছে সপরিবারে আগরতলায় বসবাস করতেন। তাঁর চারজন সহপাঠী হলেন উমেশনাল সিংহ, শচীন্দ্রলাল সিংহ (১৯০৭- ২০০০), সুখময় সেনগুপ্ত (১৯০৯-১৯৯৫) এবং হরিগঙ্গা বসাক।

দেশভাগের পরে এক বিয়ে উপলক্ষ্যে হরিগঙ্গা ঢাকায় যান। সেখানে কোনো গুপ্তচর পুলিশকে খবর দিলে পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। অকথ্য অত্যাচার করে। পিঠের চামড়া তুলে, সেখানে নুন-লঙ্কা লাগিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশের এই নিষ্ঠুর-নির্মম অত্যাচারে থানার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আগরতলা ত্রিপুরা নিবাসী ড. জগদীশ গণচৌধুরীর (বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজসেবী এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিবিই কলেজ, আগরতলা) ঐকান্তিক আগ্রহে সর্বজনসম্মুখে শ্রীহরিগঙ্গা বসাকের পরিচয় ও অবদান আনার প্রচেষ্টামাত্র করা হলো। □

বিশেষ নিবন্ধ

পিএন ঠাকুরের ছদ্মবেশে জাপান গেলেন মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু

প্রণব দত্ত মজুমদার

ব্রিটিশ ভারতের সেনাশিবিরগুলোতে সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থান ঘটাবার পরিকল্পনা বেশ ভালো ভাবেই করেছিলেন রাসবিহারী বসু। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হয়েছিল ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। তিনি লাহোর থেকে তাঁর হেড কোয়ার্টারস গুটিয়ে কাশীতে চলে এসেছিলেন। একে একে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ধরা পড়ে যেতে লাগলেন।

তিনি বুঝলেন কাশীতে থাকাও আর নিরাপদ নয়। তাই কাশীর আস্থানা ছেড়ে চন্দননগর চলে এলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর পিছনে লেগে থাকল। কয়েকবার তাঁদের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলেও বিশ্বাসঘাতকদের সংখ্যাও তো কম নয় এদেশে। রাসবিহারীর একান্ত বিশ্বস্ত সহযোগীরা তাঁর আর এদেশে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না; তাঁরা তাঁকে বিদেশে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এই মর্মান্তিক পরিণতিতে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। তিনিও উপলব্ধি করলেন এত বিশ্বাসঘাতকে ভরা ভারতভূমিতে থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। ভারতের বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাঁর চিন্তাভাবনায় এল জাপানের কথা।

এই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো, সাহিত্যে এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে যাবেন। এই সুযোগটি সুচতুরভাবে কাজে লাগালেন রাসবিহারী বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক নিকট আত্মীয় মিস্টার পিএন ঠাকুরের নামে পাসপোর্ট বানালেন। পাসপোর্ট অফিসে

একজন স্মার্ট সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তির মতো আচরণ করে বোঝালেন যে তিনি মিস্টার পিএন ঠাকুর, নোবেল লরিয়েট মিস্টার আরএন ঠাকুরের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনি আগে জাপানে গিয়ে বিশ্বকবির জন্য সব ব্যবস্থা ইত্যাদি করে রাখবেন তারপর কবি জাপানে যাবেন। তাঁর আচার আচরণে কথায় বার্তায় পাসপোর্ট অফিসের ইংরেজ অফিসারদের কোনো সন্দেহই হলো না। তাঁরা পাসপোর্ট দিয়ে দিলেন।

১৯১৫ সালের ১২ মে রাসবিহারী বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় পিএন ঠাকুরের ছদ্মবেশে খিদিরপুর ডক থেকে 'সানুকি মারু' নামে একটি জাপানি জাহাজে চেপে জাপানের উদ্দেশে রওনা দিলেন। তখন তাঁর ২৯ বছর বয়স। জাপানে গিয়ে নতুন ভাবে নতুন উদ্যমে রসদ সংগ্রহ করে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন— এই চিন্তাভাবনা নিয়েই তিনি জাপান যাত্রা করেছিলেন।

জাহাজে ওঠার সময় তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটেছিলেন। জাহাজে উঠে দেখলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটে খাবার দেওয়া হয় না। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর টিকিটের সঙ্গে খাবার যুক্ত আছে। তিনি হিসেব করে দেখলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে টিকিটের দাম কম হলেও জাহাজের ক্যান্টিন থেকে বয় বাবুর্চি দিয়ে খাবার আনিয়ে খেতে গেলে পুরো যাত্রাটিতে খরচ বেশিই পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বদলে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে নিলেন। পরে দেখা গেল এতে আখেরে খুব ভালো ফলই পাওয়া গেল। আসলে জাহাজটি পুরোপুরি যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল না। এটি ছিল আধা যাত্রীবাহী আধা মালবাহী টাইপের জাহাজ। কাজেই বেশি কেবিন ছিল না। প্রথম শ্রেণীর কেবিন ছিল মোটে তিনটি। একটিতে ছিলেন দু'জন জাপানি, একটিতে একজন ইহুদি মহিলা এবং তৃতীয়টিতে রাসবিহারী ও সুরাটবাসী একজন মুসলমান। বেশি লোক না থাকায় রাসবিহারীর পক্ষে পরিচয় গোপন করে যাওয়াটা সুবিধেই হয়েছিল। বেশিরভাগই নীচের ডেকের সাধারণ যাত্রী।

স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে প্রথম শ্রেণীতে অভিজাত ব্যক্তিরাই যাতায়াত করেন, রাসবিহারীর পরিধানেও ছিল সাহেবি পোশাক। জাহাজের জাপানি ক্যাপ্টেন প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় করতে এসে যখন জানলেন তিনি গ্রেট পোয়েট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মীয় এবং জাপানে উচ্চ শিক্ষার্থে যাচ্ছেন, ব্যাস, তিনি তাঁর খুব পছন্দের লোক হয়ে গেলেন। খাওয়ার সময় সাধারণত ক্যাপ্টেন ও জাহাজের অন্য আধিকারিকরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের সঙ্গে বসে খেতেন। রাসবিহারীকে ক্যাপ্টেনের ডান পাশে প্রথম সিটটি দেওয়া হতো। রাসবিহারী নিজের আত্মকথায় লিখেছেন— 'কিছুক্ষণ পরেই খাবার ঘণ্টা বাজিল। ঠিক কাপ্তেনের দক্ষিণ পার্শ্বে পার্শ্বে আমার স্থান, তারপর Purser, তারপর আমার কেবিনের ভদ্রলোকটি, তারপর Petty officers, কাপ্তেনের বাম

ফঃ ৫

ভাগে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, তার পার্শ্বে জাপানি যাত্রী দুটি, তারপর জু মেয়েটি, তারপর ডাক্তার এবং পেটি অফিসারেরা। অর্থাৎ আমাকে কাপ্তানের দক্ষিণ দিকের প্রথমে বসাইয়া সম্মানের জায়গাটা দিয়াছিল।' তাহলেই বুঝুন রাসবিহারী বুদ্ধি করে যে ছদ্মবেশটি ধারণ করেছিলেন তার কী মহিমা। সময় সুযোগ পেলে ক্যাপ্টেন মাঝে মাঝে ছদ্মবেশী টেগোরের সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসতেন। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সখ্য গড়ে উঠার কারণে তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে এটা তো দূর, বরং তাঁর যাত্রা অনেক সুগম হয়ে গেল। যাত্রাপথে একাধিক ব্রিটিশ অধীনস্থ বন্দর যেমন পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি অতিক্রম করে যাওয়ার সময় ব্রিটিশ পুলিশের অফিসার ও কনস্টেবলরা অন্য যাত্রীদের তল্লাশি করলেও ক্যাপ্টেনের সুপারিশে কেউ রাসবিহারীকে তল্লাশি করার জন্য বিরক্ত করতে আসত না।

পিনাং, সিঙ্গাপুর বন্দর ইত্যাদি পেরিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলল। ২৯ মে জাহাজ হংকঙে এসে পৌঁছুল। এখানে পৌঁছে দেখা গেল এখানকার সরকারের নিয়ম হলো হংকং হয়ে যে জাহাজই কোথাও যাবে তাকে জাহাজ থেকে নেমে স্থানীয় পুলিশের অফিসে গিয়ে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছ থেকে পারমিট সংগ্রহ করতে হবে। হংকংও ইংরেজ এলাকার মধ্যেই, কাজেই যার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা আছে সেই রাসবিহারী মনেমনে একটু শঙ্কিত হলেন বই কী। তীরে এসে তরী না ডুবে যায়। তবে ঈশ্বর বরাবরই তাঁকে বিপদ্মুক্ত করে দিয়েছেন। পরদিন সকালে সাহেবি পোশাকে রাসবিহারী, তাঁর ভাষায় 'Europeanised Indian'-এর বেশে গিয়ে Police Superintendent-এর অফিসে পৌঁছুলেন। সৌভাগ্যবশত সেদিন Police Superintendent নিজে ছিলেন না, তার বদলে তাঁর অধঃস্তন একজন অফিসার কাজ সামলাচ্ছিলেন। তিনি সাহেবি কেতার রাসবিহারীকে দেখে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে Good Morning বলে একটি চেয়ার এগিয়ে দিলেন। 'Europeanised Indian'-এর বেশে থাকা রাসবিহারীর পক্ষে তাঁর কাছ থেকে পারমিট নিতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। শুধু নাম জিজ্ঞেস করলে রাসবিহারী বলেছিলেন— পিএন ঠাকুর। তখন তিনি বললেন— পুরো নাম বলতে হবে। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রিয়নাথ ঠাকুর (যদিও তিনি জানেন না ওই নামে আদৌ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনো আত্মীয় আছেন কিনা)। যাইহোক, তাঁর পারমিট হয়ে গেল।

পারমিটটি ছিল এইরকম—

'The bearer Preo Nath Tagore, description as below, has permission to proceed from Hongkong to Kobe, Japan, by S.S. Sanuki Maru, leaving on 31st May 1915.

Description

Age-29 Years
Village and District Calcutta.
Height- 5 feet & 6 inches
Caste- Brahmin, Hindu
Occupation- Student.
Natioality- Indian.

Hongkong — Sd. P. Bragil
30.5.15 — for Capt
Superintendent of Police"

পরদিন যথাসময়ে জাহাজ ছাড়ল। জাহাজ ইংরেজ সরকারের এলাকার বাইরে চলে গেল। রাসবিহারী হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, আপাতত ফাঁড়া কাটল। অবশেষে ১৯১৫ সালের ৫ জুন 'সানুকি মারু' জাহাজ জাপানের 'কোবে' বন্দরে এসে পৌঁছুল। জাহাজ থেকে মালপত্র নিয়ে একটি লঞ্চে করে বন্দরের কাস্টমস অফিসে যেতে হলো চেকআপের জন্য। কাস্টমস অফিসার ছদ্মবেশী রাসবিহারীর নাম দেখে বললেন— Mr. Tagore? রাসবিহারী সম্মতি জানাতেই তিনি তাঁকে একটু বসতে অনুরোধ করে বললেন আমেরিকা থেকে তাঁর নামে কিছু চিঠিপত্র এসেছে সেগুলো অন্য অফিসে রাখা আছে তিনি আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছেন। রাসবিহারী ব্যাপারটি অনুমান করলেন এবং অফিসারটিকে অনুরোধ করলেন ফোন করে চিঠির ঠিকানায় কার নাম লেখা আছে সেটা জেনে নিতে। অফিসারটি ফোন করে খবর নিয়ে জানালেন— ঠিকানায় নাম লেখা আছে— Dr. Ranindranath Tagore. তখন রাসবিহারী বললেন— তার নাম পিএন ঠাকুর, এই চিঠিগুলো তাঁর নয়। তখন অফিসারটি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন এবং তাঁর মালপত্র পাস করে দিলেন। তিনি বন্দর থেকে বেরিয়ে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলেন।

পরদিন অর্থাৎ ৬ জুন কোবে শহরটি ঘুরে দেখলেন। ৭ জুন সকাল ১০টায় কোবে থেকে ট্রেনে করে তিনি কিয়োটো গেলেন। বেলা একটার সময় কিয়োটো স্টেশনে নেমে নিকটবর্তী একটি হোটেলে উঠলেন। ওইদিন কিয়োটো শহরটা একটু ঘুরে দেখলেন। তার পরদিন অর্থাৎ ৮ জুন তিনি সকাল সাতটার গাড়িতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় টোকিয়োর উদ্দেশে রওনা দিলেন। ট্রেনের গার্ড টিকিট দেখতে এলেন। তিনি ইংরেজি জানতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জেনে নেন রাসবিহারী। তিনি জানতে পেরেছিলেন টোকিয়োতে না নেমে তিনি যদি আগের স্টেশন শীমাবাশীতে নেমে যান তবে টোকিয়োর তুলনায় অনেক কম খরচে হোটেল পেয়ে যাবেন। এখানে থাকলে কম খরচে থাকা-খাওয়া হবে আবার টোকিয়োতে যাতায়াতের অসুবিধা নেই। কাজেই টোকিয়ো পর্যন্ত না গিয়ে রাত্রিবেলাতেই তার আগের শীমাবাশী স্টেশনেই নেমে গেলেন রাসবিহারী। রাত অনেক হয়েছে, অজানা জায়গা, তাছাড়া এখানকার ভাষাও জানা নেই; বেশ একটু অস্বস্থিই হচ্ছিল রাসবিহারীর। একটু ইতস্তত করছিলেন; এমন সময় একজন পুলিশ এসে উপস্থিত। ভাবলেন এখানে আবার পুলিশ কেন। অচিরেই বুঝলেন পুলিশটি ভিনদেশি যাত্রীটিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। ঈশ্বরের কৃপায় পুলিশটি ইংরেজি জানতেন। ওই পুলিশের সহায়তায় এত রাতে সব হোটেলের দরজা বন্ধ হয়ে গেলেও একটি হোটেলে জায়গা মিলল। সে রাতে সেখানে থেকে পরদিন সকালে কোনো ভারতীয়ের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা তাঁর খোঁজে বেরুলেন রাসবিহারী। খুঁজে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর সহযোগিতায় মাসিক ১৪ ইয়েন ভাড়ায় থাকার একটি জায়গা পেয়ে গেলেন। তারপর জাপানে শুরু হলো এই মহান বিপ্লবীর নতুন সংগ্রাম। সে এক অন্য ইতিহাস। □

পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান অন্যান্য রাজ্য থেকে ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে

সোমনাথ গোস্বামী

২০০৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ভারতের মোট ভোটারের সংখ্যা ৬৭ কোটি থেকে বেড়ে ৯৭ কোটি হয়েছে— অর্থাৎ বিশ বছরে ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি। একই সময়ে দেশের জনসংখ্যা ১০৩ কোটি থেকে বেড়ে ১৩৭ কোটির কাছাকাছি হয়েছে যা ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

ভারতের সর্বভারতীয় গড় হিসেবে ভোটার বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত দাঁড়ায় প্রায় ১.৩ : ১। তবে ভারতের দশটি জনবহুল রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই দুটি সূচকের মধ্যে পার্থক্য সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে স্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৪ সালে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৬১ লক্ষে, অর্থাৎ ৬০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি। একই সময়ে রাজ্যের জনসংখ্যা ২০০১ সালের ৮ কোটি ২ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালের আনুমানিক ৯ কোটি ৯৪ লক্ষে পৌঁছেছে— বৃদ্ধি মাত্র ২৪ শতাংশ। ফলে রাজ্যে ভোটার বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত দাঁড়ায় ২.৫ : ১, যা ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। রাজ্যের গড় উর্বরতা হার ১.৬ সন্তান প্রতি মহিলা এবং ২০২৪ সালে ভোটার জনসংখ্যা অনুপাত প্রায় ৭৭ শতাংশ। গত দুই দশকে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ২ কোটি ৮৭ লক্ষ নতুন ভোটার যোগ করেছে, যেখানে জনসংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৯২ লক্ষ। সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ভোটারের সংখ্যা ২০০৪ সালের ১১ কোটি ৬ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালে ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ হয়েছে— বৃদ্ধি ৩৯.৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বেড়েছে ২০০১ সালের ১৬ কোটি ৬২ লক্ষ থেকে প্রায় ২৬ কোটি ২০ লক্ষে, অর্থাৎ ৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি। এখানে ভোটার জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত মাত্র ০.৬৮ : ১, অর্থাৎ জনসংখ্যা ভোটারের তুলনায় দ্রুত বেড়েছে। রাজ্যের উর্বরতা হার ২.৪।

বিহারে ২০০৪ সালে ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে বেড়ে ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ হয়েছে— বৃদ্ধি ৫২.৮ শতাংশ। একই সময়ে জনসংখ্যা ২০০১ সালের ৮ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালে ১২ কোটি ৪৫ লক্ষে, অর্থাৎ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি। ভোটার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত ১.০৬ : ১ এবং রাজ্যের উর্বরতা হার সর্বোচ্চ— ৩.০ সন্তান প্রতি মহিলা।

মহারাষ্ট্রে ২০০৪ সালের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ ভোটার বেড়ে ২০২৪ সালে হয়েছে ৯ কোটি ৩১ লক্ষ অর্থাৎ ৪৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি। জনসংখ্যা ২০০১ সালের ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালের ১২ কোটি ৮৭ লক্ষে— বৃদ্ধি ৩৩ শতাংশ। ভোটার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত ১.৪৫ : ১ এবং রাজ্যের উর্বরতা হার ১.৭।

মধ্যপ্রদেশে ভোটার সংখ্যা ২০০৪ সালে ছিল ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ, যা ২০২৪ সালে ৫ কোটি ৬৭ লক্ষে পৌঁছেছে— বৃদ্ধি ৪৭৬৬ শতাংশ। জনসংখ্যা বেড়েছে ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ থেকে ৮ কোটি ৭৯ লক্ষে অর্থাৎ ৪৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধি। এখানে অনুপাত প্রায় ১ : ১ এবং উর্বরতা হার ২.০।

রাজস্থানে ভোটার সংখ্যা ২০০৪ সালের ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালে ৫ কোটি ৩৫ লক্ষে পৌঁছেছে— বৃদ্ধি ৫৪.১ শতাংশ। জনসংখ্যা ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ৮০ লক্ষে অর্থাৎ ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি। অনুপাত ১.৪ : ১, উর্বরতা হার ২.০।

তামিলনাড়ুতে ২০০৪ সালের ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ ভোটার বেড়ে ২০২৪ সালে হয়েছে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ— বৃদ্ধি ৩২.১ শতাংশ। জনসংখ্যা বেড়েছে ৬ কোটি ২৪ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ৬৭ লক্ষে অর্থাৎ ২৩ শতাংশ বৃদ্ধি। অনুপাত ১.৩৯ : ১, এবং উর্বরতা হার ১.৮।

কর্ণাটকে ভোটারের সংখ্যা ২০০৪ সালের ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষে পৌঁছেছে— বৃদ্ধি ৪১.৯ শতাংশ। জনসংখ্যা ৫ কোটি ২৯ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ১১ লক্ষে অর্থাৎ ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি। ভোটার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাত ১.২৩ : ১ এবং উর্বরতা হার ১.৭।

গুজরাটে ভোটারের সংখ্যা ২০০৪ সালের ৩ কোটি ৫২ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালে ৫ কোটি ১৫ লক্ষে— বৃদ্ধি ৪৬ শতাংশ। জনসংখ্যা ৫ কোটি ৭ লক্ষ থেকে ৬ কোটি ৬৪ লক্ষে অর্থাৎ ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি। অনুপাত ১.৪৮ : ১ এবং উর্বরতা হার ১.৯।

অন্ধ্রপ্রদেশে (অবিভক্ত) ভোটারের সংখ্যা ২০০৪ সালের ৪ কোটি ২ লক্ষ থেকে ২০২৪ সালে ৫ কোটি ৫৪ লক্ষে— বৃদ্ধি ৩৭.৭ শতাংশ। জনসংখ্যা বেড়েছে ৭ কোটি ৫৭ লক্ষ থেকে ৯ কোটি ৭৮ লক্ষে অর্থাৎ ২৯ শতাংশ বৃদ্ধি। অনুপাত ১.৩ : ১ এবং উর্বরতা হার ১.৭।

সারা ভারতের ক্ষেত্রে, ভোটারের সংখ্যা বিশ বছরে ৩০ কোটি বেড়েছে— ২০০৪ সালের ৬৭ কোটি থেকে ২০২৪ সালের ৯৭ কোটি। একই সময়ে জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৪ কোটি, অর্থাৎ ১০৩ কোটি থেকে ১৩৭ কোটিতে। সামগ্রিকভাবে ভোটার বৃদ্ধির হার ৪৪ শতাংশ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৩৩ শতাংশ।

ফলে সর্বভারতীয় গড় অনুপাত দাঁড়ায় ১.৩ : ১ এবং গড় উর্বরতা হার প্রায় ২.০ সন্তান প্রতি মহিলা। ভারতের দশটি বৃহত্তম রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য, যেখানে ভোটার বৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পার্থক্য সবচেয়ে বেশি।

এ রাজ্যে গত দুই দশকে ভোটার বেড়েছে ৬০ শতাংশ, অথচ জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২৪ শতাংশ। ফলে পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান ভারতের বাকি বড়ো রাজ্যগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র তুলে ধরে। তাই ভেবে দেখুন, এসআইআর কেন প্রয়োজন! □

অবশেষে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারত

নিলয় সামন্ত

ভারত একদিনের মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বিশ্বকাপ শুরুর সময় ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রকাশিত ক্রম অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া ছিল এক নম্বরে দু' নম্বরে, ইংল্যান্ড, তিন নম্বরে ভারত আর চার নম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা। কী আশ্চর্য! সেমিফাইনালে খেলল এই চারটি দলই। এক নম্বর অস্ট্রেলিয়াকে হারালো তিন নম্বরের ভারত আর দুই নম্বরের ইংল্যান্ডকে হারালো চার নম্বরের দক্ষিণ আফ্রিকা।

২০২৩ সালে ভারতে বসেছিল একদিনের পুরুষ ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই টুর্নামেন্টে ভারত সমস্ত দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু ফাইনালে হেরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। সেবার রোহিত শর্মার ভারতকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। আর এবার ২০২৫ সালে একদিনের মহিলা ক্রিকেট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল ভারত ও শ্রীলঙ্কায়। উদ্বোধনী খেলায় ভারত খেলায় হারায় শ্রীলঙ্কাকে। তারপর হারায় পাকিস্তানকে। কিন্তু তারপর ভারত যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে যায়। তখন তাদের রান রেটের লড়াই চলছে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। সম্মুখসমরে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডাক ওয়ার্থ লুইস পদ্ধতিতে ভারত-নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে। পরের ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বৃষ্টি। ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়।

কিন্তু সেমিফাইনালে পাওয়া যায় অন্য ভারতকে। সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে তারা ৫ উইকেটে হারিয়ে আট বছর পর আবার ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পায়। এর আগে ভারত দুবার ফাইনালে খেললেও কখনো চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এর আগে একদিনের মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ছিল দুটি দেশ। অস্ট্রেলিয়া জিতেছিল সাতবার আর ইংল্যান্ড জিতেছিল চারবার। এবার ভারত চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় বিশ্ব মহিলা ক্রিকেটে এক নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল।

এবারের এই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন ভারতের দীপ্তি শর্মা। চলতি বিশ্বকাপে ৯টি ম্যাচ খেলে তিনটি অর্ধশতরান-সহ ২১৫ রান করেছেন দীপ্তি। পাশাপাশি ২২টি ইউকেট নিয়েছেন যা প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ। পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা বিশ্বকাপ মিলিয়ে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে দীপ্তি একটি বিশ্বকাপে ২০০ রান এবং ২০টি উইকেট পেয়েছেন। একই সঙ্গে বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে অর্ধশতরান এবং পাঁচ উইকেট নিয়েছেন।

আর ফাইনালে সেরা খেলোয়াড় হলেন ভারতেরই শেফালী বর্মা। এখানেও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রীতিকা রাওয়াল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলায় ফিল্ডিং করতে গিয়ে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে না গেলে শেফালী বর্মা খেলার সুযোগই পেতেন না। কিন্তু ফাইনালে দীপ্তি দাপটের সঙ্গে ৭৮ বলে ৮৭ রান করেন। তাঁর ব্যাটে ভর করে বড়ো রান করে ভারত। ডি ওয়াই পার্টিল স্টেডিয়ামে ৪৫ ওভার বল করেছিলেন তিনি। সেই শেফালিই ভারতকে খেলায় ফেরান। প্রথম ওভারেই সুনে লুসকে ফেরান তিনি। নিজে বল করে নিজেই ক্যাচ ধরেন। অর্থাৎ ফাইনালে ৮৭ রানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ দুটি উইকেট শিকার করেন দীপ্তি।

প্রথমবার একদিনের মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের শর্মা আর ভার্মার দাপটে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করে। তবে ভারতীয় ইনিংসে যখন রান রেট কমে যাচ্ছিল তখন আমাদের শিলিগুড়ির মেয়ে উইকেট কিপার রিচা ঘোষ ৩৪ রানের একটা ঝড়ো ইনিংস খেলে যান। গ্রুপ লিগের খেলাতেও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বড়ো রান করলেও সে ম্যাচে জয় পায়নি ভারত। কিন্তু আসল ম্যাচে শেষ হাসিটা হাসে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত। ❑

‘১৬ই আগস্ট— দেন অ্যান্ড নাউ’ মঞ্চস্থ হওয়ার মাধ্যমে অ্যাকাডেমিতে সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

চলচ্চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর ১৯৪৬ সালের কলকাতায় সংঘটিত হিন্দু নরসংহারের পটভূমিতে তৈরি ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস্’ সিনেমাটি কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শন করতে দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক চাপে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল পরিবেশক, মাল্টিপ্লেক্স মালিকরা। কিন্তু কেন? এই উত্তর খোঁজার আকাঙ্ক্ষায় গত ২৭ অক্টোবর কলকাতার ‘অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্’-এর প্রেক্ষাগৃহে উপচে পড়েছিল মানুষের ঢল। প্রবীর মণ্ডলের পরিচালনায় টাকি সরস্বতী নাট্য কলা কেন্দ্রের ‘১৬ই আগস্ট— দেন অ্যান্ড নাউ’ নাটকটি এই সময়ের মানুষের মনের কথা অনেকটাই বলতে পেরেছে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে সবচেয়ে ভয়াবহ অধ্যায় হলো মুসলিম লিগের ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন’ বা প্রত্যক্ষ আঘাত। ভারত থেকে ইংরেজের চলে যাওয়ার মুহূর্তে, স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক বাসভূমি আদায়ের লক্ষ্যে মহম্মদ আলি জিন্না ডাক দিয়েছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাকশনের। ‘পাকিস্তান’-এর দাবিকে বাস্তবায়িত করতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের নেতৃত্বে কী ভয়াবহ হিন্দু হত্যা সংঘটিত হয়েছিল তা কল্পনা করা যায় না। হিন্দু নরসংহার সংঘটিত হয় বলেই হয়তো সেই গণহত্যার নাম— ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্’। এই বীভৎস গণহত্যার কয়েকদিন পর ওই বছরের ১০ অক্টোবর তৎকালীন পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে আবার হিন্দু নরসংহার হলো ইতিহাসের আরেক বর্বরতম অধ্যায়। এই নাটকের প্রথমার্ধে সেই ঘটনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কলকাতা গণহত্যার এক সপ্তাহ পরেই নোয়াখালীতে মুসলমানেরা উসকানিমূলক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রামে গ্রামে হিন্দুবিদ্বেষ ছড়ানোর লক্ষ্যে মসজিদগুলি থেকে বিভিন্ন ঘোষণা-সহ বিভিন্ন সমাবেশ, হাটে বাজারে জারিগান, কবিতা আবৃত্তি করে হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করার কাজ চলতে থাকে। তারই ফলশ্রুতি ১০ই অক্টোবর; কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রাত্রি পরিণত হলো এক ভয়ংকর রাতে। সেই রাতে কত হাজার মানুষকে যে হত্যা করা হয়েছে তা নিরূপণ করা যায়নি। হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রমহানি ঘটায় হিংস্র জেহাদি হায়নারা। ধর্মান্তরিত হয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেন নিরীহ মানুষেরা। কয়েক লক্ষ মানুষ প্রাণভয়ে পূর্ববঙ্গ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় চলে আসেন। পালিয়ে আসার সময় বহুক্ষেত্রে তাঁদের গৃহদেবতাকে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেননি। প্রবীরবাবুর যোগ্য নির্দেশনায় ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়কে নাঠকটিতে ফুটিয়ে তোলার যথাসাধ্য প্রয়াস সাধিত হয়েছে। দেশভাগের মধ্য দিয়ে মুসলিম লিগ মুসলমানদের বাসভূমি আদায় করেছে। কিন্তু এই খণ্ডিত ভূমিতে হিন্দুদের অবস্থান আজ কোথায়? নাটকটিতে এই প্রশ্ন বার বার তোলা হয়েছে। দেশভাগের পরেও সেই ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে? মুর্শিদাবাদ, মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জের সাম্প্রতিক ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি হিন্দুশূন্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ হিন্দুসমাজের একটি বিরাট অংশ নির্বিকার! এই রাজ্যে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’র আড়ালে সাধারণ মানুষকে জানতেই দেওয়া হয় না যে, কী ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের শিকার পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী হিন্দুসমাজ। নির্বাচন কমিশনের প্রথামাফিক বিশেষ, নিবিড় সংশোধন কর্মসূচি বা এসআইআরের ফলে বন্ধ বাক্স-প্যাঁটরার কোন ভূত যে কখন বেরিয়ে পড়বে এটাই এখন পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে লাখ টাকার প্রশ্ন। এই দোলাচলের মধ্যেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও হতাশার কথা তুলে ধরেছে এই নাটক।

থিয়েটার বা নাটক তো মানুষের কথা বলে। থিয়েটার হলো একটা লড়াই, থিয়েটার হলো একটি বার্তা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন যে, এর মাধ্যমে লোকশিক্ষা হয়। নির্মাণ কতটা সুচারু হলো, আলো যথাযথ হলো কী না, অভিনয়ের গুণগত দিক থেকে অধিকাংশ নবীনরা উৎরাতে পেরেছে কী না— এই নাটকে তা অপ্রাসঙ্গিক। নাটকটি এই সময়ের দাবিকে তুলে ধরেছে এটাই বড়ো কথা। গোলাম সারোয়ার ও হেকিম সাহেবের ভূমিকায় প্রবীর মণ্ডল এবং একজন সন্ন্যাসী মহারাজের ভূমিকায় ডাঃ কৃষ্ণার্জুন মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। তাঁদের অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রথমে সন্ন্যাসী এবং পরে পুলিশ অফিসারের দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন আইনজীবী দেবজিৎ সরকার। অন্যান্য ভূমিকায় অধ্যাপক ড. অরিন্দম ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য, শুক্লা বণিক, গণেশ দাস, সুমন দত্ত, অর্পণ ভট্টাচার্য্য, অদিতি চক্রবর্তী, ঈষা নন্দী, আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ভাই, তুষার, সোমা, অমিত, অরুণ, গোবিন্দ, তপন, সুব্রত, বিভাস, মানসী-রা হলেন এই নাটকের সম্পদ। নাটকটি শেষ হওয়ার পর ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের পূর্বতন রাজ্যপাল তথাগত রায়, বিশিষ্ট শিল্পী রুদ্রনীল ঘোষ ও পাপিয়া অধিকারী মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তরুণ কলাকুশলীদের প্রশংসা করেন। আগামীদিনে নাটকটির প্রদর্শন অব্যাহত রাখতে তাঁরা উৎসাহ দেন। সম্ভবত প্রথম বার এই ধরনের একটি জাতীয়তাবাদী নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার মাধ্যমে এদিন অ্যাকাডেমিতে সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাস। ▯

ভবিষ্যতের ছবি

বিনু আর তার বোন আজ বাবার সঙ্গে মিউজিয়াম দেখতে যাবে ঠিক করেছে। সকালেই ওরা ভাই-বোন তাদের ক্লাস কমপিউটার নিয়ে তৈরি হলো। তারপর বাবার সঙ্গে চলল মিউজিয়াম দেখতে।

বাবা নিজেই নিজের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। মিউজিয়ামে পৌঁছে বিনু আর তার

বোন রানি বাইরে থেকে বিশাল মিউজিয়াম বাড়িটা দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বাবা গাড়িটা পার্কিঙের জায়গায় রেখে ওদের কাছে চলে এলেন। তারপর বিনু আর রানিকে নিয়ে টিকিট কাউন্টারের সামনে গিয়ে টিকিট কাটলেন। ভেতরে ঢুকে ওরা ভাই-বোন অবাক হয়ে এদিক-ওদিক দেখছে। এত বড়ো মিউজিয়াম ওরা আগে কখনো দেখেনি। একটু এগিয়ে যেতেই ওরা দুজনেই খুশিতে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগল। ওদের খুশিতে ডগমগ দেখে বাবা মুচকি হাসলেন। ততক্ষণে বিনু আর রানি একটা কাচের ঘরে ভরে রাখা একটি সত্যিকারের গাছ একমনে দেখছে। গাছের নাম ওরা শুনেছে, ছবিতে দেখেছে, কিন্তু এর আগে ওরা কখনো সত্যিকারের গাছ দেখেনি। প্রায় দশ মিনিট ধরে ওরা কাচের ঘরটার চারপাশ ঘুরে ঘুরে অবাক দৃষ্টিতে গাছটা দেখল।

তারপর সামনের দিকে এগিয়ে চলল। এবার ওরা ২০২৫ সালের কলকাতার এক ছবি দেখল। রানি বলল, দেখ দাদা, ২০২৫ আর ২০৮২ সালের মধ্যে কত তফাত!

ওদের বাবাও সেই ছবি মন দিয়ে দেখছিলেন। তিনি তাঁর বাবার মুখে ২০২৫ সালের কথা শুনেছেন। তখন নাকি কত গাছ ছিল। মানুষ প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারত। কিন্তু তখনকার কোনো ছবি দেখেননি। মিউজিয়ামে এই ছবি দেখে তাঁর মন-প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

এরপর ওরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে চলল। এবার চোখে পড়ল ২০২৫ সালের এক চায়ের দোকানের ছবি। কয়েকজন লোক দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে চা খাচ্ছে। বিনু আর রানি দেখল, ছবিটায় দোকানের পাশে বেশ কটি গাছ। আর মানুষের মুখেও কোনো অক্সিজেন মাস্ক নেই।

রানি বিনুকে বলল, দেখ দাদা, এত গাছ থাকার জন্য কোনো মানুষের মুখে অক্সিজেন মাস্ক নেই। এখন গাছ না থাকার কারণে মানুষকে সবসময় মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরে থাকতে হয়। মাস্ক খুললেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ছবিটা দেখে এখনকার কথা ভেবে দুঃখে ওদের দুচোখে চোখে জল এসে গেল।

বিনু বলল, দেখ বোন, মানুষ যদি নির্বিচারে গাছ না কেটে ফেলত, যদি বাঁচিয়ে রাখত, তাহলে কাউকেই অক্সিজেন মাস্ক পরতে হতো না। অক্সিজেন মাস্ক ছাড়াই মানুষ বেঁচে থাকতে পারত। অক্সিজেনের অভাবেই তো এখন পৃথিবীতে কোনো পশুপাখি বেঁচে নেই।

এরপর ওরা ভারাক্রান্ত মনে আরও কতগুলি ছবি দেখে মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলো। গাড়িতে বসে বিনু শুধু একটা কথাই ভাবছে, যদি পৃথিবীতে গাছ থাকত, তাহলে মানুষকে এত কষ্ট করে বেঁচে থাকতে হতো না। রানি হঠাৎ বলে উঠল, দাদা, আমরা যদি আবার নতুন করে গাছ লাগাই? বিনু বলল, আমিও তো সেটাই ভাবছি।

বন্ধুরা! ২০৮২ সালে যেন আমাদের এমন অবস্থা না হয়, আমরা যদি আমাদের পরের প্রজন্মকে ভালোভাবে বাঁচতে দিতে চাই, অক্সিজেন মাস্ক ছাড়াই যদি মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে সবাইকে গাছ লাগাতে হবে আর কোনো গাছ কাটা চলবে না। অনেক আগেই আমাদের পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন—

একটি গাছ, একটি প্রাণ।

সপ্তর্ষি রায়, ষষ্ঠশ্রেণী, লেক টাউন, কলকাতা-৪৮

জাতীয় উদ্যান

মুকুরথি

মুকুরথি জাতীয় উদ্যান তামিলনাড়ু রাজ্যের পশ্চিম নীলগিরি পর্বতমালায় অবস্থিত। এর আয়তন ৭৮.৪৬ বর্গকিলোমিটার। এটি বন্যপ্রাণী নীলগিরি তাহেরকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ২০১২ সালের ১ জুলাই এটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি পাহাড়ি তৃণভূমি, ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ এবং বাঘ ও হাতির আবাসভূমি। উদ্যানটি তামিলনাড়ু বন বিবাগ দ্বারা পরিচালিত, যার মূল লক্ষ্য বিপন্ন শোলাতৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা। এখানে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি নেই, তবে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য বিশেষ অনুমতি পাওয়া যায়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৮৮

দ্বিতীয়া বিভক্তি: ক্লীবলিঙ্গ: (ভাগ:-১)
फलम्-फलम्। (ফল—ফলকে)
पुस्तकम्-पुस्तकम्
फलकम्-दण्डम्।
फेनकम्-फेनकम्।
अहं फलम् स्वीकरोमि।
আমি ফল গ্রহণ করি।
अहं पुस्तकम् स्वीकरोमि।
अहं पुष्पं स्वीकरोमि।
स्वीकरोमि স্থানে ददामि দিয়েও একই রকম বাক্য লিখা যায়।
যেমন, अहं चषकं ददामि। अहं लेखनीं ददामि।

ভালো কথা

বিজয়া-দীপাবলী সম্মেলন

গত ২৬ অক্টোবর আমাদের বীরেশ্বর শাখার পারিবারিক বিজয়া-দীপাবলী সম্মেলন হলো। বিকেল সাড়ে চারটায় কথা ছিল। দুপুর থেকে আকাশ মেঘে ছেয়ে ছিল। তবু আমি আর মা সবার আগে পৌঁছেছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে সবাই এল। স্বস্তিকার ছাদে আমরা মঞ্চ তৈরি করলাম। ভারতমাতার ফোটো সাজানো হলো। অনুষ্ঠান শুরু হতে যাবে এমন সময় বৃষ্টি শুরু হলো। আমরা তাড়াতাড়ি সব নিয়ে ২৬ নং কার্যালয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রবীণ প্রচারক বিজয়দা আর গীতিকা কাকিমা প্রদীপ প্রজ্বলন করলেন। তারপর মায়েদের সমবেত গান হলো। তারপরেই আমি কবিতা আবৃত্তি করলাম। তারপর একে একে নাচ, গান, আবৃত্তি এবং মায়েদের সঙ্গে ছেলেদের খেলা হলো। মাঝে এক সময় মায়েরা শাখার বিষয়ে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা বললেন। ভাগ্যিস আমার মা কিছু বলেননি। তাহলে আমার দুষ্টুমির কথা সবার কাছে ফাঁস হয়ে যেত। বাবাইদা খুব মজা করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছিলেন। শেষ হলে সবাই খেতে বসলাম। এবার এত আনন্দ হয়েছে যে কোথা থেকে চার ঘণ্টা কেটে গেল বোঝাই গেল না।

দীপমাল্য সাউ, পঞ্চমশ্রেণী, রাধা-মাধব সাহা লেন, কল-৭।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীতের মজা

যুথিকা পাল, ষষ্ঠশ্রেণী, কাটোয়া, ঘোষহাট, পূর্ব বর্ধমান।

শীত আসছে হেসে হেসে
আমি মরছি কেশে কেশে,
ভাইয়ের আমার সর্দি কাশি
তারও মধ্যে বেজায় হাসি।
ভাই বলছে শীত পড়লে
সোয়েটার টুপি সব বেরোবে
শীত লাগলেও তখন শুধু
অনেক অনেক মজা হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book & Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

দেশ-জাতি-ধর্মরক্ষার ভূমিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের এক লজ্জাজনক ইতিহাস

সুজিত রায়

আজ থেকে ৫১৮ বছর আগে ১৫০৭ সালের ২০ আগস্ট শিখপন্থের সূত্রপাত করেছিলেন গুরু নানকদেব। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। অর্থাৎ তিনি এক ঈশ্বরের ধারণা প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতবাদের মূল সূত্র ছিল জাতপাত প্রভৃতি ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাকে প্রাধান্য দেওয়া। তাই তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'গুরু কা লঙ্গর', যেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষ একত্রে বসে রান্না করতে পারেন এবং একত্রে বসে সেই রান্না করা খাবার আহার করতে পারেন।

আরও ১৬৮ বছর পর ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৪ নভেম্বর শিখপন্থের নবম গুরু তেগবাহাদুর মোগল শাসক আওরঙ্গজেবের দুর্নীতিপরায়ণ ও ধর্মীয় বৈষম্যের নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের সব মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা এবং হিন্দুদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে তিনি ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেজন্য তাকে 'হিন্দ্ কী চাদর' বা 'ভারতের ঢাল' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল। সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রবক্তা এবং মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক গুরু তেগবাহাদুরের শিরশ্ছেদ করেছিল আওরঙ্গজেব। দিল্লির চাঁদনি চক এলাকায় সংঘটিত সেই হত্যা আজও সাক্ষ্য বহন করছে শীশগঞ্জ সাহিব গুরুদ্বার।

মাঝে কেটে গেছে আরও ৩০৯ বছর। পঞ্জাবের শতদ্রু ও বিপাশা নদীর বুক দিয়ে বয়ে গেছে শিখ-মুসলমান সংঘাতের বহু রক্তস্রোত। শিখপন্থের পরম্পরায় দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ সালে মৃত্যুর আগে মানব-গুরুর পরম্পরায় ইতি টানেন। তিনি নির্দেশ দেন, পরবর্তীকালে শিখপন্থের গুরু হিসেবে মাহাত্ম্য দেওয়া হবে শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহিব'কে। সেই গুরু গ্রন্থসাহিবের মূল আসন অমৃতসর শহরের স্বর্ণমন্দিরকে গোলাবারুদের সহিংস গুদামঘরে পরিণত করেছিলেন এক স্বঘোষিত 'ধর্মগুরু' দমদমি তকসালের প্রধান জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালে ১৯৮৪ সালে। মূলত বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা এবং পাকিস্তানি মদতে শিখ গুরু পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতের জন্মদাতা এক একগুঁয়ে হিংস্র ধর্মীয় নেতা পাকিস্তানের মদতে পঞ্জাবে স্বশাসিত পৃথক ভূখণ্ডের দাবি তুলে স্বর্ণমন্দিরকে গড়ে তুলেছিলেন হিংসার অপবিত্র দুর্গে। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৪-র ৬ জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশিত অপারেশন ব্লুস্টার নামক সামরিক অভিযানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বৈজয়ন্ত ট্যাঙ্কের তোপের মুখে সপার্ষদ পুড়ে মৃত্যু হয় ভিন্দ্রানওয়ালের।

এখানেই যদি থমকে দাঁড়াত পঞ্জাব রাজনীতি তথা ধর্মনীতি তাহলে হয়তো আরও একবার মানবিকতার ঐতিহ্যবাহী পরস্পরের ইতিবাচক পদক্ষেপ-ধ্বনি শোনা যেত পঞ্জাবের বুকে। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কারণ অপারেশন ব্লুস্টারের মাত্র ছ' মাসের মধ্যে সেই ভিন্দ্রানওয়ালের মদতপুষ্ট খালিস্তানি সহিংস রাজনীতির শিকার হলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁরই বাসভবনে তাঁরই সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুই খালিস্তানি আন্দোলনে প্রভাবিত সুরক্ষাকর্মী বিয়ন্ত সিংহ এবং সতবন্ত সিংহের বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিক্রিয়া হলো বিপরীত। ইন্দিরার মৃতদেহ তখনও সৎকারের অপেক্ষায়। তার আগেই দিল্লির আনাচে কানাচে শুরু হয়ে গেল প্রকাশ্যে শিখ নিধন। শুধু দিল্লি নয়, দেশ জুড়েই যেখানে যেখানে শিখ পন্থাবলম্বীদের ছিল বিক্ষিপ্ত বসবাস, সর্বত্রই বয়ে গেল রক্তের সমুদ্র। এক কথায় যা ছিল শিখ জেনোসাইড—শিখ গণহত্যা। সেখানে রেহাই পাননি বৃদ্ধা শিখ মাতা, গর্ভবতী শিখ বধূমাতা, এমনকী শিশুরাও। ফলত, সৃষ্টি হলো শিখ বনাম হিন্দু জনজাতির এক অত্যাশ্চর্য ঘৃণার পটভূমি। যে গুরু তেগবাহাদুর হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান আক্রমণের প্রতিবাদে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, সেই পরম্পরায় পড়ল কালির ছোপ। দায়ী সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসি রাজনীতি। পঞ্জাবের মাটিতে অকালি রাজনীতি। তার রেশ আজও অব্যাহত। কারণ পাকিস্তানি উসকানি এবং প্রত্যক্ষ মদতে পুষ্ট খালিস্তানিরা আজও পঞ্জাবের বুকে যথেষ্ট সক্রিয়। কখনও সরাসরি, কখনও ছদ্মরূপে কৃষক আন্দোলনের পরিকল্পনা হিসেবে অথবা ভিনরাজ্যের নব্য রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ মদতদাতা হিসেবে। শুধু দেশেই নয়, খালিস্তানিরা আজ তাঁদের পক্ষ বিস্তার করেছে কানাডার মাটিতে বিপজ্জনকভাবে। অতীতে যার শেকড় পোঁতা হয়েছিল ইংল্যান্ডের মাটিতে। এনডিএ শাসিত ভারতবর্ষের মাটিতে শক্ত ঘাঁটি বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব বুঝে, খালিস্তানিদের এখন মূল আশ্রয় কানাডা। আর হাইড আউট বা তাদের লুকিয়ে থাকার গর্ত পাকভূমিতে। কিন্তু তার আগে?

তারকা হতে চাইলেন তারা সিংহ

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হওয়ার আগেই ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে 'পাক-ই-স্তান' সৃষ্টির মুহূর্তে যখন লাহোরে মুসলমান আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই জল্লাদদের হাতে মৃত্যু হয়েছিল সেখানের ভূমিপুত্র হাজার হাজার শিখ নারী-পুরুষ-শিশু। সেই তখনই শিখ জনগোষ্ঠী আওয়াজ তুলেছিল—সুরক্ষার স্বার্থে চাই পৃথক পঞ্জাব। সেদিনের সেই আওয়াজে ছিল না বিচ্ছিন্নতাবাদের সুর। কেবল সুরক্ষার ঢালই ছিল দাবি।

দ্বিতীয়বার পঞ্জাবের মাটিতে আছড়ে পড়ে আরও এক জোরদার

ফ ঃ ৬

আন্দোলনের কশাঘাত। সেটা ১৯৫০ সাল, অকালি নেতা মাস্টার তারা সিংহ দাবি তুললেন 'পঞ্জাবি সুবা'র। যদিও সেই দাবি শেষপর্যন্ত টেকেনি। কারণ 'পঞ্জাবি সুবা'র দাবিতে সহমত ছিলেন না পঞ্জাবের হিন্দুরা। তাঁরা শুধু প্রতিবাদই জানাননি, দাবি তুলেছিলেন, শুধু পাঞ্জাবি ভাষা নয়, 'পঞ্জাব সুবা' গঠিত হলেও সেখানে সমান সম্মান দিতে হবে হিন্দি ও উর্দু ভাষাকেও। তারা সিংহ প্রমাদ গুনলেও পিছু হঠেননি। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংসদের অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'There is no doubt that it (Punjabi Suba) has grown up not as a linguistic issue but as a communal issue.' কিন্তু তারা সিংহকে থামানো যায়নি। তাঁর নেতৃত্বে নিয়মিত স্বর্ণমন্দির পরিক্রমা শুরু করল শিখ জাঠা। দাবি সেই পঞ্জাবি সুবা। ১৯৫৫ সালের ৪ জুলাই পঞ্জাব পুলিশ ইতিহাস সৃষ্টি করল। সরকারি নির্দেশে পুলিশ ঢুকল স্বর্ণমন্দির হোস্টেল কমপ্লেক্সে। তল্লাশি শুরু হলো অকালি দল এবং শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি (SGPC)-র অফিসে। তারা সিংহের বাহিনী পুলিশকে ঘিরে ধরল। অবধারিত ফলাফল—ছোঁড়া হলো কাঁদানে গ্যাস। পঞ্জাবি জনতার ক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠল। কারণ স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বর্ণমন্দির চত্বরে এই প্রথম ঢুকল পুলিশ এবং হলো পুলিশি অত্যাচার। শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি প্রকাশ্যে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিল—স্বর্ণমন্দির চত্বরে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে পুলিশ মন্দিরের পবিত্রতা হানি করেছে। গুরু গ্রন্থসাহিবকে অপমান করেছে।

মাস্টার তারা সিংহ বছর পাঁচেক চুপচাপ রইলেন। ১৯৬০ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রবন্ধক কমিটির ১৩২ জন সদস্যকে নিয়ে তিনি অকাল তখতে দাঁড়িয়ে শপথ নিলেন—পঞ্জাবি সুবার জন্য আমরা তন-মন-ধন বিসর্জন দিতেও রাজি আছি। শপথ নিলেন এবং আন্দোলনের মূল কেন্দ্র গড়ে তুললেন স্বর্ণমন্দিরেরই একটি ঘরে। শিখ জনসমাজ কিন্তু তারা সিংহের এই পদাঙ্ককে মেনে নেননি। অজিত সিংহ সারহাদি তাঁর 'Punjabi Suba' বইতে লিখেছেন—'The decision of the organisers (of Punjabi Suba) to have Darbar Sahib (Golden Tample) as a hideout and headquarter had become the subject of criticism even by well meaning friends without appreciating the theo-political status of Gurudwaras, Particularly the Golden Temple, in the religion, history and traditions of Sikhs'. তবে তারা সিংহ এসব বিরোধিতাকে দুর ছাই বলে অগ্রাহ্য করেছিলেন। পঞ্জাবি সুবার স্বপ্নে বিভোর তারা সিংহ ১৯৬০ সালের স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্টে শুরু করলেন আমরণ অনশন। অনশনে বসার আগে বিবৃতি দিলেন—'আমি এখনই মরতে চাই না। কিন্তু আমি বেঁচে থেকে শিখপন্থের অপমান আর শিখ সম্প্রদায়ের বেইজ্জতি দেখতে পারব না। দেশের সব সম্প্রদায়ের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়কেই সবচেয়ে বেশি খাটো করা হচ্ছে। যতদিন না পঞ্জাবি সুবার দাবি কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নিচ্ছে, ততদিন চলবে আমার অনশন।

অনশন চলেছিল ৪৩ দিন। জীবন ও মৃত্যুর সুতোয় তিনি তখন দুলছেন। অগত্যা তাঁকে রণে ভঙ্গ দিতে হলো। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া কি অতই সহজ? প্রতিজ্ঞা রাখতে না পারার দায়ে শিখপন্থের নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে বিচারসভার মুখোমুখি হতে হলো। বিচারসভা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার আদেশ দিল। সেটা কী? টানা পাঁচদিন তাঁকে স্বর্ণমন্দিরে আগত দর্শনার্থীদের জুতো পরিষ্কার করতে হবে। তাই করলেন তারা সিংহ। বলা ভালো, করতে বাধ্য হলেন রাওয়ালপিণ্ডির ওই গ্রাম্য শিক্ষক। এবং অবধারিতভাবে শিখর ছোঁওয়ার স্বপ্ন থেকে ভূলুণ্ঠিত হলেন তারা সিংহ। শেষ জীবন কেটেছিল টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অকালি দলের একটি ক্ষুদ্র টুকরোর নির্জীব নেতা হয়ে।

এবার ফতে সিংহ

তারা সিংহের স্বপ্ন শেষ হতেই উঠে এলেন সন্ত ফতে সিংহ। জাতে জাঠ অকালি দলের পতাকা হাতে তুলে নিতেই শিখ সম্প্রদায় পুরোটাই চলে গেল জাঠ নেতৃত্বের হাতে। জাতে জাঠ কিন্তু উপাসনায় শিখ এই ফতে সিংহের পূর্বপুরুষরা ছিলেন পঞ্জাব-রাজ রঞ্জিত সিংহের নির্ভরযোগ্য জাঠ সেনাবাহিনীর সদস্য। ফতে সিংহও চাইতেন পঞ্জাবি সুবা। তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে টলানো যাবে না বুঝে গিয়েছিলেন। তাই নেহরুর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর জমানায় চুপচাপ থেকে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হতেই কৌশলী চাল চাললেন। তিনি অনভিজ্ঞ ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝালেন—পঞ্জাবি সুবা চাই না—শিখ রাজ্য না। শুধু চাইছেন গুরুমুখী লিপিবিশিষ্ট পঞ্জাবি ভাষাকে পঞ্জাবের রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

ইন্দিরাও দেখলেন—তাঁর পিতৃবন্ধুরা (সিন্ডিকেট) তাঁকে যেভাবে হাতের পুতুল করে নাচাতে চাইছেন, তা থেকে মুক্তি পেতে ফতে সিংহের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। অর্থাৎ পঞ্জাব হোক পঞ্জাবি ভাষার রাজ্য। কিন্তু পঞ্জাবের হিন্দিভাষীদের দাবির ফয়সালা কী হবে? কৌশলী ইন্দিরা রাজ্য ভাগ করে বানালেন নতুন রাজ্য হরিয়ানা। মূলত জাঠপন্থীদের জন্য হলেও শিখ, হিন্দু, জৈন সকলের জন্যই। আর হিমালয়ের পাদদেশের ছোট্ট টুকরো পঞ্জাব নিয়ে গড়ে উঠল ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য হিমাচল প্রদেশ।

গ্রাম্য রসিকতার সুরে সন্ত ফতে সিংহ ঘোষণা করলেন—আমার পরিবারে একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশুর জন্ম হলো। কিন্তু অন্যদের মতো তিনিও বুঝতেন— পঞ্জাব তিন টুকরো হলো। মানে পঞ্জাবের শক্তি সীমিত হলো। আর শিখ ভোটের পাল্লা ঝুঁকে রইল কংগ্রেসের দিকেই। তাই ফতে সিংহ এবার হাজির হলেন নতুন দাবি নিয়ে—চণ্ডীগড় চাই।

চণ্ডীগড়ের স্রষ্টা জওহরলাল। সৃষ্টির তাগিদটা ছিল রাজনৈতিক। চণ্ডীগড় সৃষ্টির আগে পঞ্জাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল অমৃতসর। রাজধানী হওয়ার কথা ছিল অমৃতসরেরই, কিন্তু অমৃতসর শহরটি হলো পাক সীমান্ত ঘেঁষা। অতএব জওহরলাল বেছে নিয়েছিলেন চণ্ডীগড় শহরকেই পঞ্জাবের রাজধানী হিসেবে। বিখ্যাত ফরাসি আর্কিটেক্ট লে করবুসিয়েকে দিয়ে সাজিয়ে তুললেন আধুনিক স্থাপত্যকলার শহর হিসেবে যে শহরের আইকন সিমলা হিলস্ আর কৃত্রিম লেক।

গ্রিড প্যাটার্নে নকশা তৈরি হলো শহরের। ইন্দিরা সেই শহরকে পঞ্জাবের রাজধানী করলেন বটে তবে চণ্ডীগড়কে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা দিলেন আগে। আর বললেন—চণ্ডীগড়ই হবে হরিয়ানারও রাজধানী। ফতে সিংহ আর এগোননি বটে। তবে এগিয়ে এলেন নতুন অবতার দর্শন সিংহ ফেরুমন। তিনি 'চণ্ডীগড় হবে শুধু পঞ্জাবের রাজধানী'—এই দাবি তুলে অনশনে বসে গেলেন এবং ঘোষণা

করলেন—চণ্ডীগড় না পেলে তিনি আগুনে আত্মাহুতি দেবেন। এজন্য তিনি অকাল তখতের পাশেই একটি বাড়ির ছাদে পাঁচ ফিট ডায়ামিটারের একটি সিমেন্টের পাত্র বানালেন। সেই পাত্রের গায়ে লাগানো হলো একাধিক চেন যা আত্মাহুতির আগে বেঁধে দেওয়া হবে দর্শন সিংহের শরীরে, যাতে পালাতে না পারেন। জড়ো করা হলো প্রচুর পেট্রোল ও কেরোসিন। অবস্থা বেগতিক দেখে ইন্দিরা নিজেই পঞ্জাবে গেলেন এবং শর্ত দিলেন—চণ্ডীগড় পেতে হলে ছাড়তে হবে আবোহর ও ফাজিলকা। ওগুলি হিন্দু অধুষিত অঞ্চল। তাই ওগুলি পাবে হরিয়ানা। দর্শন সিংহ ফেরুমন রাজি হয়ে গেলেন। হরিয়ানাকে সরানো গেল! কিন্তু আসলে হলোটা কী? পঞ্জাব ফাজিলকা ও আবোহর হারালো। কিন্তু চণ্ডীগড় যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। ইন্দিরার এই প্রতারণা পঞ্জাবের কাছে জিইয়ে রইল দগদগে ক্ষতচিহ্ন হয়ে। সেই ক্ষতচিহ্ন তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল ইন্দিরার শরীরে ৮০টা বুলেটের ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়ে। সময় ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর।

আনন্দপুর সাহিব প্রস্তাব

১৯৭৩ সালে এই প্রতারণার জবাবি ভাষা গঠনের জন্য অকালি নেতারা আনন্দপুর সাহিব গুরুদ্বারায় বসলেন দীর্ঘ আলোচনায়। দাবি তোলা হলো ১২টি। সব দাবির পিছনেই পাখির চোখ ছিল Greater autonomy for Punjab অর্থাৎ পঞ্জাবের জন্য বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন। দাবিগুলি কী ও কেমন?

১। প্রতিটি রাজ্যের সমহারে উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার প্রগতিশীল বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাজ্যগুলির অধিকার পূরণে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস সাধন।

২। চণ্ডীগড় সম্পূর্ণভাবে এবং এককভাবে পঞ্জাবকেই দেওয়া হোক। অন্য কোনো রাজ্যকে ভাগ দেওয়া যাবে না।

৩। মূলধনী ব্যবসায়ের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে সততার সঙ্গে কায়িক পরিশ্রম এবং তার ফলের সমবণ্টন নীতি গ্রহণ করুক কেন্দ্র।

৪। পঞ্জাবের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে পঞ্জাবিভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক।

৫। জম্মু ও কাশ্মীরে আশ্রিত পঞ্জাবি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

৬। অন্যান্য রাজ্যে পঞ্জাবি ভাষাভাষীর মানুষকে সরকারি চাকরি ও বিবিধ ক্ষেত্রে সমপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হোক।

৭। কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত ও বেশি উৎপাদনের স্বার্থে যন্ত্রায়নের সুযোগ দিতে হবে।

৮। শ্রমিক শ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় পদক্ষেপ।

৯। অমৃতসর শহরের একটি বেতার কেন্দ্র গঠন যেখান থেকে গুরুবাণী কীর্তন প্রচার করা হবে।

১০। কৃষিযোগ্য জমি সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তিকর ও এস্টেটকর বহির্ভূত করতে হবে।

১১। তপশিলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়নে একটি বিশেষ মন্ত্রক গঠন করা।

১২। পঞ্জাবে দ্রুত ৬টি সুগার মিল ও চারটি টেক্সটাইল মিল খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (শুধুমাত্র মূল বিষয়গুলি এখানে উত্থাপিত হলো।)

আনন্দপুর সাহিবের এই প্রস্তাবগুলি মূলত উন্নয়ন প্রস্তাব মনে হলেও আসলে প্রতিটি প্রস্তাবের মধ্যেই মিশে ছিল স্বশাসনের দাবি দাওয়া। তাই কেন্দ্র এই প্রস্তাব নিয়ে কোনও আলোচনাতেই বসতে রাজি হয়নি। তৎকালীন অকালি দলের সভাপতি হরচাঁদ সিংহ লঙ্গোয়াল বিবৃতি দিয়েছিলেন—'আমরা শেষবারের মতো একটা কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই—ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা শিখজাতির নেই। শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ চায় শুধুমাত্র ভারত সরকারের সমস্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ এবং শিখদের ধর্মীয় জীবনধারায় অবিরাম প্রবাহে অযথা বাধামুক্ত হয়ে বসবাস করতে। নিঃসন্দেহেই অন্যান্য ভারতবাসীর মতোই শিখ সম্প্রদায়ও ভারতীয়ই।

জনতা সরকারের আমলেও অকালি দল একটি অর্থবহ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাংবিধানিক পরিকাঠামো বদলের দাবি জানিয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার পর দাবিগুলিকে ধর্মের চাদরে মুড়ে আরও জোরদার করে তোলা হয়েছে এবং মাথা চাড়া দিয়েছে প্রকৃতই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যার নাম সন্ত জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালে।

ভয়ংকর ভিন্দ্রানওয়ালে

পঞ্জাবের মোগা শহরের কাছে রোদা গ্রামের এক জাঠ যুবক জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালের বেড়ে ওঠা দমদমি অকাল শিখ গুরুমুখী ধর্মীয় স্কুলে। দীর্ঘ ৬ ফুট লম্বা পাতলা চেহারার এক ধর্মপ্রচারক। পরনে হাঁটু অবধি লম্বা ঢিলেঢালা শার্ট। তার নীচে শর্টস। কাঁধে ঝোলানো বেল্ট বাঁধা তরোয়াল। আরও পরিণত বয়সে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের পর কাঁধে থাকত বন্দুক। কোমরে রিভলবার আর বুকে আড়াআড়ি বুলেটের বেল্ট। কোমরে ভোজালি। নাক উঁচু এবং গভীর কোটরাগত দুই চোখের অধিকারী ভিন্দ্রানওয়ালে দ্রুত হয়ে ওঠেন জনপ্রিয় ধর্মপ্রচারক। জনপ্রিয়তা ছিল এতটাই যে তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ময়দানে অপেক্ষা করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। ১৯৭৭ সালে দমদমি তকসালের নেতৃত্ব পাওয়ার পর তাঁর কর্মস্থল ছিল মেতো চক গুরুদ্বারায়। অমৃতসর শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে।

ভারতীয় রাজনীতিতে ভিন্দ্রানওয়ালের প্রবেশ ও উত্থানের কাহিনি অনেকটা আকাশে ধূমকেতুর আগমনের মতোই। কাকতালীয় কিনা কে জানে, ১৯৭৭ সালে ভিন্দ্রানওয়ালে দমদমি তকসালের কর্তা হলেন আর সেবারেই ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, জরুরি অবস্থা জারি করার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া অনেকটাই ইতিবাচক উঠুক যাতে মানুষের মনে গণতন্ত্রের যে ধারণা তা পোক্ত হয়ে কংগ্রেসকে এনে দিত কাঙ্ক্ষিত ফলাফল।

কিন্তু বিধি বাম, জয়প্রকাশ নারায়ণের উত্তাল আন্দোলনে ইন্দিরা বিরোধী হাওয়া জোরদার হয়ে উঠল, 'নিজের ঘর' রায়বেরিলীতেও হারলেন স্বয়ং ইন্দিরা। আর তখন পঞ্জাবে কী হলো? অকালি দল জয়প্রকাশ নারায়ণের জনতা দলের শরিক হয়ে ভোটে জিতল শুধু নয়, কেন্দ্রের সরকারেও যোগ দিল।

একহাত দেখে নেওয়ার শপথ নিয়ে পঞ্জাবে মন দিলেন ইন্দিরা তনয় সঞ্জয় গান্ধী। পঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা জ্ঞানী জৈল সিংহের সঙ্গে

হাত মিলিয়ে সঞ্জয় গান্ধী অকালি দলকে ভাঙার কারিগর হিসেবে বেছে নিলেন সেই জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালেকেই। দাবার বোড়ে হিসেবে পাওয়া গেল নিরঙ্কারীদের। নিরঙ্কারীরা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর হচ্ছেন নিরাকার। এঁরা গুরু গোবিন্দ সিংহকে গুরু হিসেবে মানতেন না। গোঁড়া শিখপন্থীদের কাছে নিরঙ্কারীরা ছিলেন ধর্মত্যাগী। কিন্তু অকালি দল রাজনৈতিক স্বার্থে ১৯৭৮-এর ১৩ এপ্রিল বৈশাখী উৎসবের দিন নিরঙ্কারীদের অমৃতসরে বৈশাখী উৎসব পালনের অনুমতি দিয়ে দিল।

হাতে চাঁদ পেলেন ভিন্দ্রানওয়ালে। তাঁর সমর্থক দল খালসাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অকালি দলের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলেন এবং দলবল নিয়ে 'রাজ করেগা খালসা' ধ্বনি তুলে নিরঙ্কারীদের ধাওয়া করলেন। যুদ্ধ লেগে যায় এমন একটা পরিস্থিতিতে দল খালসার এক সেনা ফৌজা সিংহ তরোয়াল খুলে নিরঙ্কারীদের আক্রমণ করে বসল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিরঙ্কারী গুরু বাবা গুরবচন সিংহের দেহরক্ষী গুলি করে হত্যা করল ফৌজা সিংহকে। যুদ্ধ রোখা গেল না। দু'পক্ষের ধর্মযুদ্ধে নিরঙ্কারী মারা গেল তিন জন। দলখালসার মারা গেল ১২ জন। ভিন্দ্রানওয়ালে ঘোষণা করলেন দল খালসার যারা নিরঙ্কারীদের আক্রমণ করেছিল, তাদের সম্মান জানানো হবে। প্রমাদ গুনল অকালি নেতৃত্ব। শিখপন্থীদের সন্তুষ্ট রাখতে সরকারিভাবে মামলা হলো নিরঙ্কারীদের বিরুদ্ধেই। লাভ হলো ভিন্দ্রানওয়ালের। এই ঘটনার এগারো দিনের মাথায় দিল্লি শহরে নিহত হলেন গুরুবচন সিংহ। ভিন্দ্রানওয়ালে এই প্রথম হত্যার রাজনীতিতে হাত পাকালেন। এরপর একের পর এক নিরঙ্কারী হত্যা হতে থাকল নিঃশব্দে। আর ভিন্দ্রানওয়ালে আগ্নেয়াস্ত্র এবং সশস্ত্র দলবল নিয়ে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

কংগ্রেসের কাছে তখন ভিন্দ্রানওয়ালে হিরো। ফলত ভিন্দ্রানওয়ালে এক 'খুনি সন্ত' থেকে পরিণত হলেন বিশ্বাসঘাতক ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে। তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হলো নতুন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন খালিস্তান আন্দোলন।

সাংবাদিক হিসেবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পঞ্জাবের আনাচে কানাচে ঘুরে এই প্রতিবেদক প্রত্যক্ষ করেছে খালিস্তানিদের। নিজের চোখে দেখা অজস্র ঘটনা এবং বহমান ঘটনার স্রোত আমায় মনে করিয়ে দিত ১৯৭০–৭১ সালের পশ্চিমবঙ্গের ভয়ংকর নকশাল আন্দোলনের কথা। কথায় কথায় হত্যা তখন পাঞ্জাবের রোজনামচা। কোনও বাদবিচার ছিল না। রাজনীতির মানুষ যেমন নিহত হয়েছেন, তেমনি নিহত হয়েছেন অতি সাধারণ মানুষ, যাদের কাছে রাজনীতি ছিল বিলাসিতা। শত হস্ত দূরে থাকতেন তাঁরা এই ভয়াবহ রাজনীতি থেকে। তাও তাঁরা রেহাই পাননি। খালিস্তানিদের মূল ঘাঁটি ছিল গুরুদাসপুর জেলা যা ছিল পাকিস্তানে যাতায়াতের স্বর্গদ্বার। ইন্দিরা হত্যাকারী সতবন্ত সিংহ ছিল এই গুরুদাসপুরেরই আফুয়ান গ্রামের বাসিন্দা। আমি নিজে দু'বার গেছি সেই গ্রামে। গেছি গুরুদাসপুর সীমান্তেও। দেখেছি, ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিখ রেজিমেন্টের একাংশও কতখানি ছিল খালিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে।

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীও নীরবে মেনে নিয়েছিলেন ভিন্দ্রানওয়ালের এই মানুষ হত্যার রাজনীতি অথবা ছেলে সঞ্জয় এবং জৈল সিংহের চাপে মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত চরমতম পরিস্থিতিতে তখন লঙ্গোয়ালকেও হত্যা করলেন ভিন্দ্রানওয়ালে এবং স্বর্ণমন্দিরকে গড়ে তুললেন নিজস্ব দুর্গ, তখন আর ইন্দিরার চুপ করে থাকার উপায় ছিল না।

১৯৮৪-র ৩১ মে গভীররাতে তিনি বাধ্য হলেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে—ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে খতম করা। সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন—দখল নাও স্বর্ণমন্দিরের। আগেভাগে টুঁ শব্দ না করেই হই হই করে শ'য়ে শ'য়ে সেনাকর্মী ঘিরে ফেলল গোটা অমৃতসর শহর। ঢুকে পড়ল সাঁজোয়া বাহিনী একেবারে স্বর্ণমন্দির চত্বরেও। যা ভিন্দ্রানওয়ালে নিজেও কখনও ভাবেননি। সেটাই হলো— দেশের মানুষের বিরুদ্ধে দেশীয় সেনার লড়াই।

কিন্তু তখন ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার বাহিনী পাক-মদতে এতটাই সশস্ত্র যে ২ জুন থেকে ৬ জুন—টানা ছ'দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকেও নাস্তানাবুদ করে দিয়েছিলেন ভিন্দ্রানওয়ালে। মারা গিয়েছিল ১০০-রও বেশি সেনাকর্মী। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাধারণ পর্যটক মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩০০-রও বেশি।

জুন মাসের সেই অপারেশন ব্লুস্টারেরই প্রতিশোধ নিল খালিস্তানিরা ১৯৮৪-র ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করে।

সতবন্ত সিংহের সঙ্গে তখন তিহার জেলের অভ্যন্তরে ছোট্ট মেক-শিফট্ আদালতে দেখা হতো রোজ। মিটিমিটি হাসত। একদিন হঠাৎই শৌচালয়ে কড়া পাহারার মধ্যে মুখোমুখি হয়ে গেলাম সতবন্তের।

—'অন্যায় হলো, পাপ হলো—মনে হয়?'

আমার প্রশ্ন শুনে ছোট্ট জবাব দিয়েছিল—

জো কুছ কিয়া ধরমকে লিয়ে কিয়া। কোই সোচ নেহি।

ফাঁসি হয়েছিল সতবন্ত সিংহের। সরকারিভাবে ১৯৯১-এ দাবি করা হয়েছিল পঞ্জাবে শান্তি ফিরেছে। কেমন শান্তি ফিরেছে, দেখার জন্য টানা একমাস ধরে পঞ্জাবের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। কিছু ইতিবাচক ঘটনা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু পূর্ণ শান্তি তখনও দুরঅস্ত।

সম্ভবত আজও তাই। উত্তাপ হয়তো কমেছে। কিন্তু ছাইচাপা আগুন আজও ধিকিধিকি জ্বলছে। জ্বলছে এখন খালিস্তানের হেডকোয়ার্টার কানাডায়। সেখানকার ভারতীয়রা সন্ত্রস্ত, ভীত। কখন কী ঘটবে কেউ জানে না। তাই শিখপন্থী শান্তিপ্রিয় মানুষরা আজও বলে ফেলেন—আমরা এক ট্র্যাজিক ইতিহাসের সাক্ষী শুধু নয়, ট্র্যাজিক ইতিহাসের বলিও। পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে পঞ্জাবের জনগণের ওপর গুরু বিশ্বাসের নামে যে সন্ত্রাস আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার যন্ত্রণা আমাদের বইতে হবে আজীবন। সেই যন্ত্রণার প্রতিধ্বনি আজও সমানভাবে বহমান।

শিকারী পাখি পবিত্র স্থানে পাওয়া যায়,
তবু তারা জীবন্ত জিনিস খায়;
যদিও তারা সাদা পোশাক পরে,
তাদের হৃদয় মন্দ......

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক এবং দীর্ঘ সময়ব্যাপী খালিস্তান আন্দোলনের প্রতিবেদন লেখক।)

দেশভাগ, শ্যামাপ্রসাদ ও বাস্তবতা

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে মুসলিম লিগ দেশ ভাগকে নিশ্চিত করে। সে সময়ে বঙ্গের প্রিমিয়ার (প্রধানমন্ত্রী) সুরাবর্দি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে হিন্দুর ওপর আক্রমণ বর্বরতম জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। মুসলিম লিগ সমগ্র বঙ্গকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির দাবি জানালে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫ এপ্রিল, ১৯৪৭ সালে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে বলেন— 'I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let two major communities residing herein live in peace and freedom'।

বঙ্গ বিভাগের সরাসরি দাবি সেদিন তুলেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। হিন্দু মহাসভার পাশাপাশি বঙ্গপ্রদেশ কংগ্রেসও বঙ্গ ভাগের দাবি জানিয়েছিল, যদিও হিন্দু মহাসভার মতো অতি বলিষ্ঠ দাবি সেখানে ছিল না। হিন্দু মহাসভা বঙ্গের হিন্দুদের জন্য আলাদা ভূমির দাবি করে জনমত সংগ্রহে সক্রিয় হয়। আর কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এ বিষয়ে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না।

বড়লাট ওয়াভেলের জায়গায় মাউন্টব্যাটেন আসেন ২২ মার্চ, ১৯৪৭-এ। এসেই ঘোষণা করলেন পরের বছর জুনের ১ তারিখ তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। যে ব্রিটিশরাজ ভারতকে পরাধীন রেখেছে তাদের ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া এই তীব্র ব্যাকুলতা বিস্ময়কর। ভারতীয়দের জীবন ও জীবিকার প্রতি বিন্দুমাত্র সহমর্মিতা ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগও আগত প্রায় ক্ষমতার ভাগ নিতে বড়োই উদ্‌গ্রীব ছিল। লিওনার্ড মোসলের কাছে নেহরু স্বীকার করেন ক্ষমতার লোলুপ আকাঙ্ক্ষা— 'The truth is that we were tired men, and we were getting on the years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again and of we had stood out for united India as we wished it, prison obviously awaited us.'

দেশভাগের কথা ১৯৪৮ সালের জুনে থাকলেও সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগ্রাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপ্রকৃতির কারণে মাউন্টব্যাটেন তা এগিয়ে আনেন ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট। নেহরু খণ্ডিত দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেও ১৯৪৮-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনই ছিলেন এ দেশের ক্ষমতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ যখন জিন্নার মূল লক্ষ্য তখন পঞ্জাবের মতো বঙ্গভাগের দাবি করেন ড. শ্যামাপ্রসাদ। বঙ্গ ভাগ হবে বুঝতে পেরে জিন্না সুরাবর্দির সঙ্গে হীন চক্রান্ত করে পাকিস্তানের বাইরে অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ গঠনকে সমর্থন করেন। আর এই দুরভিসন্ধির ভেতরটা দেখতে না পেয়ে সার্বভৌম বঙ্গের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে আত্মঘাতী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের দাদা শরৎচন্দ্র বসু। সেদিন শ্যামাপ্রসাদ ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বাঙ্গালির রক্ষাকর্তা হয়েছিলেন। ১৯৪৬-এর ২৭ এপ্রিল দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে সুরাবর্দিকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন যে স্বাধীন বঙ্গ গঠনে তিনি রেফারেন্ডাম গ্রহণ করবেন

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের এক তৃতীয়াংশ জমি নেওয়া হোক। তিনি ভারত সরকারকে আরও বলেছিলেন, শান্তিপূর্ণ ভাবে জনসংখ্যা ও সম্পত্তির বিনিময়ের অতি বাস্তবোচিত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

কিনা। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ছিল স্বাধীন বঙ্গ ভবিষ্যতে পাকিস্তানে যুক্ত হবে কিনা। সুরাবর্দি স্পষ্ট বলেন স্বাধীন বঙ্গ গঠনে রেফারেন্ডাম গ্রহণ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আর স্বাধীন বঙ্গের পাকিস্তানে ভবিষ্যতে যোগদান সম্পর্কে তিনি নীরব থাকেন।

আসলে জিন্নার লক্ষ্য ছিল শহর কলকাতা। যদিও কলকাতার ২৩.৬ শতাংশ অধিবাসী ছিল মুসলমান। কলকাতা যে তাঁর লক্ষ্য জিন্না মাউন্টব্যাটেনের কাছে তা গোপন করেননি ২৬ এপ্রিল, ১৯৪৬-এর আলোচনায়। স্বাধীন বঙ্গ প্রসঙ্গে বলেন—

I should be delighted. What is the use to Bengal without Calcutta; they had much better remain united and independent; I am sure that they would be on friendly terms with us.

১৯৪৭-এর ১০ মে বেলেঘাটায় গান্ধীজীর কাছে সুরাবর্দি স্বাধীন বঙ্গ বিষয়ে আলোচনা করেন। সেখানে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, অর্থমন্ত্রী মহম্মদ আলি, আবুল হাশিম প্রভৃতি। গান্ধীজী অবশ্য তাঁদের যুক্তিতে প্রভাবিত হননি। নোয়াখালি ও কলকাতা হিন্দু নরসংহারের সঙ্গে ভারতের নানা প্রান্তে জেহাদি আক্রমণ তাঁর বাস্তববোধকে পীড়িত করে। এ সময় তারকেশ্বরে বঙ্গভাগের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ বাস্তবতা বোধ দ্বারা চালিত হয়ে বলেন— 'মুসলমানদের প্রতি আমার কোনোই বিদ্বেষ ভাব নেই, আমরা তাদের উপর বৈরীভাব পোষণ করি না কিংবা আধিপত্যও করতে চাই না। কিন্তু আমরা মুসলিম লিগের নীতির সমালোচনা করছি, কেননা তা ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী।'

শরৎচন্দ্র বসু বাস্তবতাহীন কোনো এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে সুরাবর্দিদের সঙ্গে স্বাধীন বঙ্গপ্রদেশ গঠন করতে চাইলে ড. মুখার্জি প্রবল বিরোধিতা করে বঙ্গ ভাগ করে হিন্দুদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড দাবি করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেঘনাদ সাহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো অত্যন্ত কৃতবিদ্য বাস্তববাদী নির্লোভ ব্যক্তিত্বরা। ছোটলাট বারোজ জানাচ্ছেন যে শরৎচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গপ্রদেশ ভাগের বিরোধিতা করলেও সংখ্যাগুরু হিন্দু জনমত যুক্ত প্রস্তাবে রাজি নয়। এবং বলা নিষ্প্রয়োজন অতি বাস্তবোচিত এই সিদ্ধান্তের জন্য সর্বাগ্রে কৃতিত্ব দিতে হয় রাজনৈতিক হিন্দু ড. শ্যামাপ্রসাদকেই।

হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ গঠনেই তাঁর ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। কোটি কোটি বাঙ্গালি হিন্দু উদ্‌বাস্তুদের জন্য ছিল তাঁর বাস্তব মানবিক নিরসনে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন বাঙ্গালি হিন্দুদের পুনর্বাসনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের এক তৃতীয়াংশ জমি নেওয়া হোক। শান্তিপূর্ণ ভাবে জনসংখ্যা ও সম্পত্তির বিনিময়ের অতি বাস্তবোচিত বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ভারত সরকারকে তিনি বলেছিলেন। এক্ষেত্রে পঞ্জাবের দৃষ্টান্তকে তিনি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শিয়ালদহ স্টেশন সংলগ্ন এলাকা, বনগাঁ সীমান্ত, রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু উদ্‌বাস্তু শিবির পরিদর্শন করে ছিন্নমূল মানুষদের পাশে দাঁড়ান। আন্তর্জাতিক মোড়ল সাজার অবাস্তব পরিকল্পনা থেকে সরে এসে তিনি অতি বাস্তব দৃষ্টিতে বঙ্গ ভাগ ও তার পরিণামকে উপলব্ধি করেছেন।

বঙ্গ ভাগের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলনে দিল্লির কংগ্রেসের খুব একটা উৎসাহ ছিল না। ১৯৪৬-এ ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনে অসম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের প্রসঙ্গ নিয়ে কংগ্রেস কথা বললেও ৪৫ ভাগ হিন্দু নাগরিক সমৃদ্ধ বঙ্গের ব্যাপারে গান্ধীজীর কংগ্রেস নীরবই থাকে। ১ জুন, ১৯৪৭-এ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের সমর্থনে লিখেছিলেন—

'বঙ্গভঙ্গ রোধ করুন। স্বাধীন বঙ্গ গড়ে তুলুন।'

স্বাধীন বঙ্গ যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মুহূর্তে ইসলামিক বঙ্গে পরিণত হতো শরৎচন্দ্র বসুর মতো নেতা না বুঝলেও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রথম বুঝেছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে, ইতিহাস বিস্মৃত আত্মঘাতী বাঙ্গালি বহু দশক ড. শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লুকিয়ে রেখেছিল। আত্মশক্তির নতুন ভারতে তাঁর চর্চা ও মূল্যায়ন ড. শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দূরদর্শিতার প্রতি পুনঃ শ্রদ্ধাঞ্জলি। সচেতন রাজনৈতিক এই হিন্দু নেতা আত্মঘাতী ধর্মনিরপেক্ষ লাঠিতে ভর করে হাঁটেননি, পকেটে সুদৃশ্য গোলাপ ফুল লাগিয়ে দেশের মানুষকে কাঁটা উপহার দেননি। যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় সংসদের 'বার্ক' বলে অভিনন্দিত হন তাঁকেই বামাচারী রাজনীতি বা পরিবারবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল নিজেদের স্বার্থে বিস্মৃত করতে চেয়েছে সর্বোচ্চ চেষ্টায়। কিন্তু ভারতকেশরীকে তো রুদ্ধ রাখা যায় না। তাঁর সতেজ উপস্থিতি বহু দর্শক অতিক্রম করেও সতত সতেজ— 'কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে'।

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

'দিব্যজ্ঞান নয়, কাণ্ডজ্ঞান চাই'

নারায়ণ শংকর দাশ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, কোনোকালেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি হয়ে উঠতে পারলো না। এরাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো মহান দেশপ্রেমিককে 'কুইসলিং', ও 'তেজোর কুকুর' অভিধায় ভূষিত করে। এমনকী, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের ডাকা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের মিটিং থেকে কুখ্যাত সুরাবর্দি, খাজা নাজিমুদ্দিনরা সরাসরি প্রাণঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী মানুষ নিধনের ডাক দিয়েছিল। সেই মিটিঙে লিগের সহযোগী দল কমিউনিস্ট পার্টি শুধু যোগই দেয়নি, তাদের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু সেদিন অক্টারলোনি মনুমেন্টের নীচে মঞ্চ আলো করে এই লিগ নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল— পাকিস্তানের দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে। এককথায় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে ধর্মের নামে, ধর্মকে ভিত্তি করে একটি নিজস্ব স্বাধীন দেশ পাবে। এককথায় গাছের খাবে ও খণ্ডিত হওয়া দেশে থেকে তলারও কুড়াবে।

আর এটাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে মানতে হবে। না মানলেই, তাকে আখ্যা দেওয়া হবে সাম্প্রদায়িক। সেখানে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনার কোনো স্থান নেই। নেই মানবিকতা কিংবা দেশহিতের কোনো স্থান। দীর্ঘদিন ধরে জাতি-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে একসঙ্গে বসবাসকারী সাধারণ মানুষদের কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছার দাম নেই। অখণ্ড ভারতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষার ঊর্ধ্বে উঠে, সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চাওয়ার কোনো দাম নেই। শস্তা সেন্টিমেন্ট তুলে খেপিয়ে তুলতে পারলেই হলো। সহজ, সরল, সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করা, একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। অন্তত সাম্প্রতিক ইতিহাস তো এমন কথাই বলে। যদিও আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি, সাম্প্রতিককালের ঘটে যাওয়া ইতিহাস ভুলতে ওস্তাদ। এমনকী স্বাধীনতার পরে দেশের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টরা স্লোগান তুলতো,— 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, ভুলো মত, ভুলো মত'। এর মধ্যে যে উদ্দেশ্য সেটা হলো, শক্তিশালী রাজ্য এবং দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি। যেটা হলে পরবর্তী পর্যায়ে ভারতকে ভেঙে আরও টুকরো করা সহজ হয়। এধরনের ভয়ংকর রক্তবীজ আজও ভারতের নানা প্রান্তে শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দেশে সর্বনাশের জন্য ওত পেতে রয়েছে। এদের বাড়বাড়ন্ত রুখতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রবাদী শাসন কিংবা জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি।

প্যালেস্তাইনের প্রসঙ্গ এলে যেটা অনেকেই জানে, তবুও সেটা বলতেই হয়, ভারত প্যালেস্তাইনের সন্ত্রাসী হামাস দলকে কোনোভাবেই সমর্থন করে না, কিন্তু সমর্থন করে প্যালেস্তাইনের ওয়েস্ট ব্যাংকে অবস্থিত সভ্য, ভদ্র ফাতা পার্টিকে, যা ইয়াসের আরাফাতের তৈরি। ভারতও প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা চায়, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী হামাস দলের হাত ধরে কখনোই নয়। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য একাধারে সন্ত্রাস বিরোধী, পাশাপাশি যুদ্ধ বিরোধী। এটাই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ। কিন্তু আঘাত এলে, তার উপযুক্ত প্রত্যাঘাত এ ভারত সর্বদা প্রস্তুত। ঘটে যাওয়া দু একটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইকই তার প্রমাণ। এ এক নতুন ভারত, যাকে অনেক ভারত বিরোধীরা মন থেকে মেনে নিতে চায় না, ভীষণ কষ্ট পায়।

সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণ ভূমি মধ্যপ্রাচ্য, সবদিক থেকেই পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে পিছিয়ে পড়া মধ্যপ্রাচ্য, সতত কলহপ্রিয়, যুদ্ধবাজ মধ্যপ্রাচ্য, জেহাদিদের আঁতুড়ঘর মধ্যপ্রাচ্য, সেটা হতেই পারে, কিন্তু শিক্ষায়, মন-মানসিকতার, প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা ভারতবর্ষ কখনোই নয়। ইউরোপ আমেরিকা তো কখনোই নয়। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য, একমাত্র ইজরায়েল ছাড়া আর কোথাও জনগণের ভোটে সরকার গঠিত হয় না। যদিও দীর্ঘদিন ইজরায়েলের সংস্পর্শে থেকে এবং দেশের স্বীকৃতি না পেয়েও প্যালেস্তাইনে ইয়াসার আরাফাত, জনগণের দ্বারা ভোটে সরকার গঠন করেছিলেন ফাতা পার্টির মাধ্যমে, স্বল্প কালের জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে সন্ত্রাসী হামাস দল জনগণের ভোটে জিতে যায়।

ফলস্বরূপ, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধ শুরু। এদিন হামাস জঙ্গিরা গাজায় নিরীহ ইহুদীদের ওপর নির্মম হত্যালীলা এবং কংক্রিটের সুড়ঙ্গে অগণিত মানুষদের বন্দি না করলে, এই যুদ্ধ হয়তো সংগঠিত হতো না। তার ফলে গাজায় লক্ষাধিক নিরীহ শিশু, বৃদ্ধ, সাধারণ প্যালেস্তাইন বাসীর অকালে প্রাণ যেত না। গাজাও এমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো না।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৪৩)

দারিদ্র্য-ভূষণ

ডাক্তারজীর অর্থাভাব চিরস্থায়ী ছিল, কিন্তু একসময় তাঁর আর্থিক অভাব বন্ধুদের চোখে পড়তে লাগলো। বড়ো ভাই শুধু পৌরোহিত্য করে সংসার নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। ডাক্তারজী নীচের তলার এক পাশের একটি ঘর ভাড়া দিয়ে কিছুটা আর্থিক সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন। প্রায় সব সময় স্বয়ংসেবকদের যাতায়াত লেগেই থাকতো। তাদের চা ইত্যাদি আপ্যায়নের ব্যাপারে সর্বদা আগ্রহী হতেন তিনি। কখনো দুপুরে কেউ এলে, একসঙ্গে বসে ভোজন করতেন তা বাসি ভাদড়ি (বিশেষ শক্ত রুটির মতো), ডাল, আর তেল লঙ্কার চাটনি। আর খেতে বসে গল্প কথায় এমন ভাবে যে মশগুল হতেন, খাওয়াটা তখন হতো গৌণ, আনন্দটাই বড়ো। তাঁর ভেতরের কষ্ট কারও অনুভব হওয়ার সুযোগ হতো না। কোনো অনুগ্রহ বা দানের কথা ডাক্তারজীর মতো অপরিগ্রহী ব্যক্তিত্বের কাছে বলার সাহসই হতো না। ডাক্তারজীর নিঃস্বার্থভাবে নিরন্তর সঙ্ঘের সমাজসেবার কাজে সক্রিয় থাকার কথা রাজা লক্ষ্মণরাও ভোঁসলে জানতেন। বন্ধু হলেও ডাক্তারজীকে কিছু নেওয়ার কথা বলার তার সাহস হয়নি কিন্তু তার ম্যানেজার সংগমকরকে দিয়ে প্রস্তাব দিলেন— কিছু জমি দান করতে চান বলে। প্রথমে ডাক্তারজী পাত্তা দেননি কিন্তু পরে সংগমকর তাঁর অনুমতির জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলে ডাক্তারজী বেশ উষ্মা প্রকাশ করে বললেন— 'এই কথা আবার বললে আমি এখানে আসাই বন্ধ করে দেব, আমার সম্পত্তি তো সঙ্ঘই'। ব্যাপারটা এমন যেন কেউ তার শিরোভূষণ নামাতে বলছে। সংগমকর ওরকম প্রচেষ্টা আর করেননি।

সিন্দির নানাসাহেব টালাটুলে বিপ্লবী জীবন থেকেই ডাক্তারজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মাঝে মাঝে প্রায় জোর করেই বিশ্রামের জন্য নাগপুর থেকে ডাক্তারজীকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যেতেন। তখন ওয়ার্ধা থেকে আপ্পাজী জোশীও আসতেন। একদিন তিনজনের আলোচনার মধ্যে নানাসাহেব বললেন— 'সর্বক্ষণ সামাজিক সর্বজনীন কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন বাড়ির দিকে মনোযোগ দেওয়ার আপনার সময় থাকে না। এই কারণে আর্থিক চিন্তা আপনার পিছু ছাড়ছে না, এর একটা সুরাহা হওয়া দরকার'। ডাক্তারজী তাদের পীড়াপীড়িতে বললেন— 'আমার প্রয়োজন হলে আমি চেয়ে নেব। যার কাছ থেকে টাকাপয়সা বা কোনো কিছু গ্রহণ করলে সে উপকার করেছে বলে মনে করে না এবং চাপও পড়ে না, তার দান আমি গ্রহণ করি। কিন্তু এখন তার কোনো প্রয়োজন নেই'। বন্ধুত্ব রক্ষা এবং যাচনা না করা এই নীতি রক্ষার জন্য তিনি এমন কথা বলেছিলেন। নানাসাহেব, নারায়ণরাও, আর্বীর দেশপাণ্ডে ও আপ্পাজী জোশী এই কথার উপর ভিত্তি করে গোপনে ডাক্তারজীর বউদির হাতে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে লাগলেন। সংসারের দুরবস্থায় একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে ডাক্তারজী বউদির কাছে কৌশলে ব্যাপারটা জেনে নিলেন এবং তিন জনের সঙ্গে দেখা করে বললেন— 'আপনারা আমার কথার ভালো মানে করেছেন। আমার যখন সত্যিই দরকার হবে তখন অসংকোচে চেয়ে নেব'। এরপর ওরকম আর করবেন না। ডাক্তারজীর কথায় স্বামীজীর সেই বার্তা মূর্ত হয়ে উঠলো— 'যা আছে সব বিলিয়ে দাও কিন্তু পরিবর্তে কিছু চেয়ো না'।

শেষে ডাক্তারজীর কয়েকজন বন্ধু মিলে 'আইডিয়াল ডেমোক্রেটিক ইনসিওরেন্স কোম্পানি' বলে একটি সংস্থা খোলেন এবং তার চিকিৎসা বিভাগে প্রধান বলে ডাক্তারজীকে নিযুক্ত করলেন। নানাসাহেব তেলঙ্গ প্রমুখ সজ্জন ব্যক্তিদের ডাক্তারজীর প্রতি অসীম ভালোবাসার ফলস্বরূপ ছিল এই ব্যবস্থার শুভ সূচনা। এই নিযুক্তির ফলে ডাক্তারজীর বছরে চার পাঁচশো টাকার ব্যবস্থা হতো। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৫-৩৬ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রী রা: জ: গোখলে লিখেছেন— 'এতে ডাক্তারজীর কী লাভ হয়েছিল, তা তিনি ভালোই জানেন, কিন্তু তাঁর নাম সংস্থার পরিচালকদের নিকট যথেষ্ট লাভজনক হওয়া সম্ভব ছিল সন্দেহ নেই।'

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস